আমাদের ছুটি
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
www.amaderchhuti.com

☐ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা - বৈশাখ ১৪১৮☐

ইন্টারনেটের দৌলতে পৃথিবী এখন ছোট হতে হতে সত্যিই কম্পিউটার বা ল্যাপটপের স্ক্রিনে বন্দী। পাশাপাশি বাঙালিও বেড়ানোর নেশায় আর পেশার সুবাদে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অনেকটাই বিশ্বনাগরিক। কিন্তু পায়ের তলায় সর্ষের সেই অনুভব তো তেমনভাবে পাইনা আন্তর্জালের দুনিয়ায় – পিকাসা, ফ্লিকার, ফেসবুক, অর্কুট – নানান ওয়েবসাইটে অনেকে আপলোড করেন বেড়ানোর ছবি, বেড়িয়ে এসে কেউবা নিজস্ব ব্লগে পোস্ট করেন তাঁর ভাল লাগার কথা – কিন্তু এগুলো প্রায় সবটাই ইংরেজিতে। আমরা চাইছিলাম এমন একটা আন্তর্জাল বাংলা ভ্রমণ পত্রিকা – যেখানে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকেই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে বেড়ানোর কথা, সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়া যাবে প্রিয় জায়গাগুলোর ছবি। সেই আকাঙ্খা থেকেই জন্ম নিল 'আমাদের ছুটি'। একটা সর্বাঙ্গীন সফরসঙ্গী - নানান জনের বেড়ানোর গল্প আর ছবির পাশাপাশি বিভিন্ন বেড়ানোর জায়গার হদিস, রেল-বিমানের খোঁজখবর, ভারতের রাজ্য পর্যটন ওয়েবসাইটগুলির ঠিকানা ও আরও অনেককিছু।

www.amaderchhuti.com

এই চারাগাছকে বড় করে তুলতে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টাতো থাকছেই – কিন্তু তা পূর্ণতা পেতে পারে তখনই যদি আপনি-ও এগিয়ে আসেন আপনার বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায়-

"নানা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টুকরো টুকরো দেখতে দেখতে ভাবি, আমাদের দেশের মতো এমন দেশ কি আর আছে যেখানে প্রকৃতির সম্ভার এসে জড়ো হয়েছে একত্র!" - 'আমাদের ছুটি' -র সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রিয় কবি শঙ্খ ঘোষ

☐ আরশিনগর ☐

তার সাথে মনে মনে কথা বলা চলে
– কৌশিকব্রত দে

উন্নয়ন অথবা উচ্ছেদ – আধুনিকতার অবশ্যম্ভাবী কোন ফসল রোপিত হবে আগামীদিনে,কে জানে! তবে সেদিন মহুয়া, শাল, পিয়ালের একাকী মৌন এই পাহাড়টার গা থেকে হারিয়ে যাবে আদিম নৈঃশব্দ্য।

☐ সব পেয়েছির দেশ ☐

এ জীবন পুণ্য করো
- অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম নয়, পুণ্য নয়, শুধুমাত্র আনন্দের অন্তহীন নেশা। গলি তস্য গলির এঁদো গন্ধে একটিবার দেবতার উৎসবের সাক্ষী হওয়া...

www.amaderchhuti.com

পবিত্র হ্রদের তীরে
- শীলা চক্রবর্তী

স্বপ্নের মত ...মাটিতে যেন স্বর্গ নেমে এসেছে। তিরতিরে নীল জলে কাঁপছে আমাদের বিস্ময় অনুভূতিগুলো...

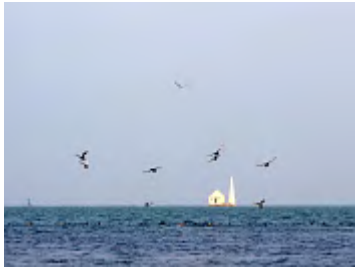

জলসই
- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

'আগে আগে পান্ডা হাঁস চলেছে, পিছে পিছে তীরের ফলার মতো দু'সারি হাঁস ডাক দিতে দিতে উড়ে যাচ্ছে' - "মানস-সরোবর! ধৌলাগিরি!" - নাঃ, অদ্দুরে নয়, রিদয় আর সুবচনীর হাঁসের সঙ্গে পিছু পিছু পরিযায়ী ডানা মেলে পাড়ি চিল্কা থেকে গোপালপুর।

☐ ভুবনডাঙা ☐

আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি
- সিদ্ধার্থ পাল

লুকলা থেকে হাঁটা শুরু করে দুধকোশী উপত্যকা হয়ে নামচে বাজার। নামচের পরে ইমজা খোলা উপত্যকা পেরিয়ে থ্যাংবোচে। থ্যাংবোচে থেকে প্যাংবোচে হয়ে পথ থেমেছে ফেরিচে বা ডিংবোচেতে। এরপর খুম্বু গ্লেসিয়ারের লবুচে পয়েন্ট পেরিয়ে গোরক শেপে শেষ থামা। এখান থেকে গ্লেসিয়ারের গা বেয়ে পৌঁছানো এভারেস্ট বেস ক্যাম্প। পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে হাঁটাপথের রোমাঞ্চ...

☐ শেষ পাতা ☐

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই কিন্তু এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন -

admin@amaderchhuti.com

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কথোপকথন

মনে মনে আমরা সবাই ভুবনভ্রামণিক – কিন্তু বাস্তবে যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে এর রূপ, রস আর গন্ধের আস্বাদ নিই তখন ঘটে যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য – বোঝা যায় দেখার চোখ কত আলাদা হতে পারে, তাই অভিজ্ঞতাও হয়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন। কথোপকথনে আমরা সেই ভিন্নতাকে ধরারই চেষ্টা করেছি। আর সেই জন্যই এমনই কিছু অন্যরকম ব্যক্তিত্ব - যাঁরা সামান্যতেই খুঁজে পান অসামান্যের ইশারা, তাঁদের ভাবনায় ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করতে চেয়েছি 'আমাদের ছুটি' আর তার আগ্রহী পাঠকদের।

www.amaderchhuti.com

এই সংখ্যায় আমরা কথা বলেছি কবি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে।

ছেলেবেলাতো আপনার বাংলাদেশেই কেটেছে। সেইসময়ে বেড়ানোর কোন স্মৃতির কথা মনে পড়ে?

- বেড়ানোর সঙ্গে টাকাপয়সার একটা সম্পর্ক আছে। ছেলেবেলায় আমাদের পরিবারের যে আর্থিক দশা ছিল তাতে কোথাও বেড়াতে যাবার ভাবনাটা ছিল স্বপ্নবিলাস। বেড়ানো বলতে তখন শুধু বুঝতাম পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়িতে যাওয়া, কখনো-বা মামাবাড়ি। অবশ্য, সত্যিকারের বেড়ানোরই একটা স্বাদ মিশত তাতে, কেননা ওসব যাওয়া মানে ছিল অনেক নদীপ্রান্তর পেরিয়ে, অনেক রূপ-রূপান্তর। পাবনা জেলায় পদ্মাপাড়ের ছোটো একটা শহর থেকে অনেক দূরে বরিশালের কোনো গ্রামে পৌঁছনো, কিংবা মেঘনাপাড়ের চাঁদপুরে। যেতে হতো ভেঙে ভেঙে, আর সেটাই ছিল খুব উপভোগের। ভোরবেলায় পাকশী ছেড়ে রানাঘাট, রানাঘাট থেকে বনগাঁ, বনগাঁ থেকে খুলনা। সন্ধে হয়ে আসত ততক্ষণে, ট্রেনযাত্রা ছেড়ে উঠতে হতো তখন স্টিমারে। শেষ রাতে সেই স্টিমার পৌঁছত এক গঞ্জে, সেখানে নামতে হবে আমাদের। আর স্টিমার চলে যাবে বরিশাল শহরে, আমরা বসে থাকব ভোরের প্রতীক্ষায়। ভোর হলে, দরদাম করে উঠে বসব এক নৌকোয়। সারাদিন ধরে দুলকি চালে চলবার পর সন্ধের মুখে পৌঁছে যাব আমাদের গ্রামে। এই-যে নানা বাহনে যাওয়া, ভিন্ন ভিন্ন জেলার পথঘাট তরুপ্রান্তর নদীখাল দেখতে দেখতে যাওয়া, দুদিন ধরে যাওয়া, এটাই ছিল আমাদের ছেলেবেলাকার বেড়ানো।

অনেকদিন পরে পর্যটক হিসেবে নিজের দেশের মাটিতে পা রাখার অনুভূতিটা কেমন?

- 'রোমাঞ্চ' শব্দটা পড়েছি অনেকসময়ে, ব্যবহারও করেছি, কিন্তু আক্ষরিক ভাবে শারীরিকতায় তার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি যখন অনেকদিন পরে ছেড়ে-আসা-দেশের-মাটির ছোঁয়া পেলাম। এক মুহূর্তে গোটা অতীতটা বর্তমানের মধ্যে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবার সে-অনুভূতিটা ভুলবার নয়। এ-রকম অবস্থায় অনেকেরই মনে হয় যে সবকিছু পালটে গেছে, কিছুই আর আগেকার মতো নেই। আমার হয়েছিল উলটো। মনে হয়েছিল সবই যেন ঠিক তেমনি আছে, বদলে গেছে শুধু মানুষজনের চেহারা। সে তো বদলাতেই পারে।

ছোটবেলায় ওপার বাংলায় থাকলেও, কলকাতাতেই জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন। এই শহরে বেড়ানোর কোন প্রিয় ঘটনা বলবেন?

- এই শহরের মধ্যেই বেড়ানো? হ্যাঁ, তেমনও অনেক স্মৃতি আছে, ছেলেবেলারই। তিন থেকে সাত বছরের সময়টা পর্যন্ত কলকাতাতেই ছিলাম আমরা। তখন, ইচ্ছে হলে ট্রাম কোম্পানি থেকে নেওয়া যেত অল্-ডে টিকিট। সে টিকিটে শহরের যে-কোনো প্রান্তে যে-কোনো ট্রামে চলাফেরা করা যেত সারাদিন ধরে। ভাইবোনেরা সবাই মিলে বাবা-মার সঙ্গে তেমনি একবার ঘুরে দেখছিলাম কলকাতা, চিনছিলাম তার জাদুঘর বা চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা অক্টার্লোনি মনুমেন্ট (এখন যার নাম শহিদ মিনার) - ঘুরে ঘুরে বা চূড়োয় উঠে সেসব দেখার তৃপ্তি আজও কিছু জেগে আছে মনে।

আমেরিকা, বাংলাদেশ, ভুটান -কবিতার টানে অনেক দেশই ঘোরা আপনার। আবার ভারতেরও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন। এইসব নানানজায়গার মধ্যে আলাদা করে কোনোটার কথা মনে পড়ে?

- যে-কোনো নতুন জায়গাতে গেলেই আমার ভালো লাগে, বিশেষ কোনোটির কথা আলাদা করে বলা মুশকিল। মনের মধ্যে এক-এক জায়গার এক-এক চিহ্ন থেকে যায়। সবটাই বিশেষ।

অন্যদেশে বেড়াতে গিয়ে কি কখনো এখানের সঙ্গে তেমন কোন পার্থক্য আপনার মনে দাগ কেটেছে?

- প্রত্যেক দেশে পৌঁছেই নিজের দেশের সঙ্গে তুলনা করে ভাবাটা অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরিচ্ছন্ন পথঘাট দেখলেই মনে হয় আমাদেরও-বা হবে না কেন এরকম, শৃঙ্খলা দেখলে মনে হয় আমাদের কেন হলো না এটা। কেবলই এই না-এর ধাক্কাটা লাগে। একটা ব্যাপারে শুধু জয়ী লাগে মনে। নানা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টুকরো টুকরো দেখতে দেখতে ভাবি, আমাদের দেশের মতো এমন দেশ কি আর আছে যেখানে প্রকৃতির সম্ভার এসে জড়ো হয়েছে একত্র !

www.amaderchhuti.com

সম্প্রতি কোথায় বেড়াতে গেছেন?

- শেষ যেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম সে হলো থাইল্যান্ড। এ কোনো বহুবিজ্ঞাপিত পর্যটন-কোম্পানির সঙ্গ নেওয়া নয়, একেবারেই পারিবারিক এক ভ্রমণ, স্বনির্ভরতায়। নজনের এক দল। তার মধ্যে তিনজনই শিশু। অনেক জায়গাতেই ঘোরা গেল সে-দেশে, উত্তর থেকে দক্ষিণ। সেখানকার মনে রাখার মতো অনেক ছবির মধ্যে একটার কথা বলি। দেশের উত্তরতম প্রান্তে, মেকং নদীর ধারে, চিয়াং-মাই নামের জায়গাটিতে, বসে থেকেছি বা ঘুরে বেড়িয়েছি দুপুর থেকে সন্ধে। এ হলো তিন দেশের এক সংযোগ বিন্দু। নদীর উত্তরে তাকালে বাঁ-পাশে মায়ানমার, আর ডাইনে লাওস। মেকং নদীর ধার বরাবর পরিচ্ছন্ন ফুটপাতে বড়ো বড়ো মাদুর ছড়িয়ে সারি সারি খাবার দোকান, সেখানে বসেই পছন্দমতো বেছে নিয়ে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা। নদীর ধারে, প্রায় পিকনিকের ভঙ্গিতে থাই -খাবার খেতে খেতে দেখেছি অপরিচিত দেশের হালচাল, আস্তে আস্তে কোমল হয়ে আসছে রোদ, তারপর নেমে আসছে সন্ধ্যা। জলের ধার পর্যন্ত নেমে গিয়ে দলের বাচ্চারা কুড়িয়ে নিচ্ছে নদীকূলের নুড়িপাথর, বড়োরা হয়তো তুলে নিচ্ছে নাম -না -জানা ফুল।

বেড়ানোর যে গল্পটা এখনো কোথাও লেখেননি তেমন একটা গল্প শোনাবেন?

- আরো একবার বাংলাদেশে ঘুরে আসতে হলো কদিন আগে। ছোটো একটা সরকারি দলের সঙ্গে এই ঘুরবার একটা রাবীন্দ্রিক সূত্র ছিল। ঢাকা থেকে সাজাদপুর, সাজাদপুর থেকে কুষ্টিয়া, আবার সেখান থেকে শিলাইদহ। রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি কুঠিবাড়িগুলি দেখাটাই ছিল সফরের মূল উদ্দেশ্য। দুই দেশের সরকার একসঙ্গে মিলে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের কথা ভাবছেন তখন, সেই উপলক্ষে এই দেখাশোনার ব্যবস্থা। জায়গাগুলি আমার আগেই জানা, কিন্তু একটা সরকারি দলের সঙ্গে ঘুরবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম, সেজন্য ভিন্ন রকমের একটা কৌতুকবোধ হচ্ছিল আপ্যায়নের ঘটা দেখে। যাওয়াটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে আরো একটা কারণে। সাজাদপুর থেকে কুষ্টিয়া যাবার পথে গোটা কন্‌ভয়টা হঠাৎ একটু বেঁকে গেল মূল পথ থেকে ডাইনে, হাজির হলো পদ্মাতীরের এক মফস্বল শহরের ছোটো একটা স্কুলে। এই স্কুলে

আমি পড়েছিলাম। বিকেল তখন, কিন্তু তবু কেমন করে সেখানে জড়ো হয়ে গিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং প্রাক্তন কিছু ছাত্র। অল্প সময়ের জন্য একটা যেন প্রাক্তনী সম্মেলনই ঘটে গেল সেখানে। সরকারি পর্যটন বলে সামনে পিছনে ছিল কিছু পুলিশি গাড়ি। ওই অবেলায় স্কুলের সামনে পুলিশ আর অতসব গাড়ি দেখে সাধারণ মানুষজনের একটা ভিড় জমে গিয়েছিল। ফিরে আসছি যখন, আমাদের দলের একজনের কাছে পৌঁছল এক স্মরণীয় সংলাপ। ভিড়ের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠেছেঃ 'এরা কারা? কী হচ্ছে এখানে?' উত্তরে শোনা গেলঃ 'ইস্কুল দেখতে এয়েচেন ইস্কুলের মা-বাবা!'

এমন কোনো জায়গার কথা মনে হয় যেখানে আপনি যাননি কিন্তু যেতে ইচ্ছে করে। কেন?

- ম্যাপ খুলে বসলে যে বিন্দুটা চোখে পড়ে, সেখানেই চলে যেতে ইচ্ছে করে আমার। এ-ইচ্ছের কোনো শেষ নেই। কেন ইচ্ছে করে? কেননা সবটুকুকেই জানতে চায় মন, চোখের দেখা দিয়ে।

বাংলা সাহিত্যে বেড়ানো নিয়ে লেখার চলটা চিরকালই ছিল। দিকপাল সাহিত্যিকরা সাহিত্যের এই ধারাটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু আজকের প্রজন্মের লেখার মধ্যে ভালোলাগার সেই অনুভূতিটা তেমনভাবে কি পাওয়া যায়?

- 'সাহিত্য' বলে তো আলাদা কিছু ব্যাপার থাকে না ভ্রমণলেখায়। লেখার সাবলীলতায় তৈরি হয়ে ওঠে একটা আলগা সৌন্দর্য, আর সেটাকেই তখন বলি সাহিত্যগুণ। এটা ঠিক যে এখনকার ভ্রমণবিষয়ক অনেক লেখাই হয়ে উঠেছে তথ্যপুঞ্জ শুধু, যেন কোনো বিস্তারিত ট্রাভেল-গাইড। সে-রকম শুকনো লেখায় ভরে যাচ্ছে কাগজগুলো, তা ঠিক। কিন্তু ভ্রমণকথার অন্য সরস রূপটা যে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে তা মনে হয় না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন লেখেন তাঁর কোনো ভ্রমণের কথা, তখন তো সবসময়েই সেটা সাহিত্য হয়ে ওঠে। কিংবা নবনীতা দেবসেন। কিংবা অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। পরবর্তী প্রজন্মের লেখায় এই ধরনটা খুব একটা দেখতে পারছিনা সেটা সত্যি। আপনাদের যে অন্যরকম মনে হচ্ছে তার একটা কারণ হয়তো এখনকার তুচ্ছ লেখার অজস্রতা। ভ্রমণবিষয়ের পত্রিকাই এখন অনেক, আবার অন্যান্য পত্রিকাতেও একটা অংশ হিসেবে থাকে ভ্রমণকথা। এতসব স্তূপের মধ্যে সাহিত্যরসের লেখাগুলি অনেকসময়ে হয়তো চাপা পড়ে যায়, তা ঠিক।

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

তার সাথে মনে মনে কথা বলা চলে...

কৌশিকব্রত দে

☐ তথ্য- বিহারীনাথ (পশ্চিমবঙ্গ) ☐ || ☐ বিহারীনাথের ছবি ☐

দেখলে মনে হয় পাহাড় যেন ঘরের উঠোনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পাহাড় তো, তাই স্বভাবে কিছুটা হয়ত রহস্যময়। বর্ষার মেঘ কখনও তার চুড়োকে ঢেকে দিচ্ছে, কখনও রোদ-ছায়ার মোহময়তা তাকে ঘিরে রাখছে। আসলে তো পাহাড় নয় টিলা। ১৪৮০ ফিটের আস্ত একটা টিলা - বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য টিলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। ছোটনাগপুর মালভূমিটাইতো এরকম ছোট ছোট কত টিলায় ভর্তি। কিন্তু বিহারীনাথ যেন সবার চেয়ে অপরূপ। আদিম নৈঃশব্দ। মহুয়া, শাল, পিয়ালের একাকী মৌন এই পাহাড়টা বড় আপন, বড় নিজের করে পাওয়া। সে একটা জীবন্ত পাহাড়। তার সাথে মনে মনে কথা বলা চলে...।

www.amader chhuti.com

বর্ষায় পাহাড়ের রঙ থাকে সবুজ আর তার ওপর রোদ আর মেঘের ছায়ার নানা মায়াবী খেলা চলে। তা দেখতে দেখতেই কখন বেলা বয়ে যায়। পাহাড় বেয়ে ওঠাও খুব একটা শক্ত নয়। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়েই পায়ে চলা পথ উঠে গেছে। তবে বর্ষায় বেশ বিপজ্জনক। পাহাড়ের ওপরে কোনও বসতি নেই। বিহারীনাথ থেকেই চোখে পড়ে শরপাহাড়ি আর দূরের দিগন্তরেখায় আঁকা আবছা পাঞ্চেত পাহাড়। সব মিলিয়ে খুব রোমান্টিক বিহারীনাথ।

পাহাড়ের নীচেই আছে শিব মন্দির, লাগোয়া জলাশয়। মন্দিরের পাশ দিয়ে কালো যে পিচ রাস্তাটা সাপের মতন এঁকে বেঁকে চলে গেছে সেটা গিয়ে পড়েছে শালতোড়ায়। এই রাস্তাটাই বিহারীনাথের একমাত্র রাস্তা। শালতোড়ার দিকে যেতে জনহীন এই পথের দু'ধারে আছে আরও কিছু নাম না জানা ছোট ছোট টিলা। রাস্তাটার অন্যপ্রান্ত একটু গিয়েই পড়েছে একটা তেমাথায়। তেমাথার একটা পথ গেছে ৫ কিমি দূরে দামোদরের পাড়ে- যার উল্টোদিকে বর্ধমান জেলার শিল্পনগরী বার্নপুর। এইদিকের পথটা অবশ্য কিছুটা মাত্র পাকা। বাকিটা কাঁচা। দামোদরের পাড়টা বেশ মনোরম। নদীর চর ধরে অনেকটা যাওয়া যায়। তেমাথার অন্য পথটা গেছে ইতুড়ির দিকে। এই ইতুড়ি থেকে একেবারে লালমাটির একটা ভাঙাচোরা রাস্তা গেছে ৩ কিমি দূরে বিনোদপুর গ্রামে। বিনোদপুর অবধি গাড়ি যায়। বিনোদপুর থেকে এক কিমি বনপথ ধরে হাঁটলেই বিনোদপুরের ছোট্ট একটা ড্যাম। ড্যামের জলাশয়ের ঠিক অপর পাড়েই মাথা তুলেছে ছোট ছোট টিলা। স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে একটা টিলার নাম জানা গেল 'লেদুরি'। বনের মধ্যে জনমানবহীন এই জলাশয় প্রান্তরে প্রকৃতি আর মন যেন মিলেমিশে একটাই সত্তা হয়ে যায় কখন।

কয়েকটা দিন নির্জন প্রকৃতির কোলে বেশ কেটে গেল। উঠেছিলাম শালতোড়া পঞ্চায়েত সমিতির লজে। এখানে ওটাই একমাত্র থাকার জায়গা। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও লজেই। ঘরোয়া খাওয়া - পোস্তর প্রিপারেশনটা মনে রাখার মতো। ফেরার পথে শুনলাম এখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের খোঁজ পাওয়া গেছে। স্পেশাল ইকনমিক জোন হিসেবে সরকার এই অঞ্চলকে ভাবছেন। নামকরা একটি সংস্থা রিসর্টের জন্য জমিও কিনে ফেলেছে পাহাড়ের সামনে। এখানকার আদিবাসী মানুষগুলোর মূল জীবিকা বছরে একবার মরশুমি চাষ, ছোট ছোট স্টোন ক্রাশিং কারখানা আছে অনেক - সেখানে দিন মজুরি খাটা আর বেআইনি কয়লা পাচার। এসব হলে নাকি বদলে যাবে এই জীবন, উন্নতি হবে মানুষগুলোর। হয়তোবা সত্যি তাই অথবা আসলে হয়তো এদের সরে যেতে হবে। বাইরে থেকে আসবে দক্ষ শ্রমিকের দল। কে জানে!

সে যাই হোক না কেন, বিহারীনাথ তখন বোধহয় আর আমার পাহাড় থাকবে না- আমার সাথে এভাবে আর কথা বলবে না...।

☐ *তথ্য- বিহারীনাথ (পশ্চিমবঙ্গ)* ☐|| ☐ *বিহারীনাথের ছবি* ☐

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

www.amaderchhuti.com

এ জীবন পুণ্য করো

অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

☐ তথ্য- বেনারস (উত্তরপ্রদেশ) ☐|| ☐ বেনারসের ছবি ☐

শ্বেত পাথরের থালার মতো চাঁদটা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। অথচ রাস্তায় এখনও স্ট্রিটলাইটই ভরসা। হোটেলের তিনতলার বন্ধ ঘরটা থেকেই মানুষের যাতায়াত বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল। মাঝেমধ্যে আবার সমবেত জোরালো কণ্ঠে ভোলা মহেশ্বরের জয়ধ্বনি। গত তিনদিন ধরেই চলছে এমন উৎসবের রেশ। আজ সেই পরমলগ্ন। কার্তিক পূর্ণিমায় গঙ্গামহোৎসব। বারাণসীর পিচ ঢালা রাস্তা রাত তিনটে-সাড়ে তিনটে থেকেই ঢাকা পড়েছে ভক্তমানুষের ভিড়ে। কাতারে কাতারে লোক চলেছে দলবেঁধে। হাতের মুঠোয় পুঁটলি-প্যাকেটে শুদ্ধবসন। স্নান সেরে পরতে হবে যে। কাঁখে শিশু, পাশে প্রিয়জন, মুখে চাপা স্বরে অনবরত 'ওঁ নমঃ শিবায়'। আজ রহিস-ধনীর সাথে অনাথ-আতুর মিলে গেছে বারাণসীর রাজপথে। এক ফাঁকে আমি আর ছোট ভাই বুকানও মিশে গেলাম জনস্রোতে। ভিড়টা একই দিকে যাচ্ছিল বলে অত লোকের মাঝেও হাঁটতে কোনও অসুবিধা হল না। ওদের লক্ষ্য গঙ্গার পুণ্যবারিতে ধর্মস্নান, আর আমার ইচ্ছে মানুষের এই মহামিলন মেলার মূহুর্তগুলোকে ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দী করে রাখা। গোধূলিয়া মোড় থেকে বাঁহাতে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে বেঁকতেই ভিড়টা যেন আরও তিনগুণ বেড়ে গেল। জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে ঘাটের কিনারায়।

www.amaderchhuti.com

ততক্ষণে আকাশটা বেশ ফর্সা হয়েছে। তবে দিনের সোনা তখনও দিগন্তের আড়ালে। এই শীতল ঊষাকালই পুণ্যস্নানের মাহেন্দ্রক্ষণ। ইতিমধ্যে বহু মানুষই ডুব দিয়েছেন পতিতপাবনীর তরঙ্গে। সিঁড়ির ধাপে ধাপে সারি বাঁধা আতুর চোখের মিছিল। সামনে সাজানো শূন্য ভিক্ষাপাত্র। কোনও কোনও পাত্রে কিছুটা চাল আর পাঁচ-ছটা খুচরো পয়সা। কেউ আবার ভস্ম মেখে ত্রিশূল হাতে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়ির চাতালটায়। অপেক্ষা কোনও জলজ্যান্ত অন্নপূর্ণার।

হাওড়া স্টেশনে যেমন কুলি বা ট্যাক্সির খোঁজ করতে হয় না, উল্টে তারাই খোঁজ করে নেয় যাত্রীর। তেমনি আমাদেরও কোনও মাঝির খোঁজ করতে হল না। তবে দাম যা হাঁকল তাতে দমটা বন্ধ হয়ে যায় আর কি। এক ঘন্টা নৌকোভ্রমণ সাড়ে চারশো। বিকেলে এই রেটই নাকি আড়াই হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে, সাংঘাতিক! খানিক দরাদরি করার পর বউনির খাতিরে সাড়ে চারশো কমে সাড়ে তিনশোয় দাঁড়ায়। অবিশ্যি আর পাঁচজন যাত্রীর সঙ্গে গেলে মাথাপিছু অনেক কমই পড়ত। কিন্তু আমি আর ভাই গোটা একটা নৌকো ভাড়া করলাম একঘন্টার জন্য। এর মধ্যে মানমন্দির ঘাটে জড়ো হয়েছে আরও অনেক পুণ্যার্থী। ঘাটে রাখা বড় বড় ছাতাগুলোর তলায় সাধুবাবাজির সাধনভজন। পাশেই গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছে হিন্দুস্তানী মেয়ে-বৌ। হয়তো আরও আগে ওদের স্নান সারা হয়ে গেছে।

ঘাট ছেড়ে নৌকোটা একসময় দুলে উঠল নদীর বুকে। মাঝির হালে ছলাৎ ছলাৎ জল কেটে যায়। এগিয়ে চলি সূর্যোদয়ের পথে। হ্যাঁ, অনেকটা তাই-ই। আমরা যত মাঝগঙ্গার দিকে এগোচ্ছি সূর্যও তত যেন মেঘঘোমটার আড়াল সরিয়ে নীল আকাশে সোনার হাসি বিলোচ্ছে। এও যেন এক উৎসব। পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে এমন উৎসব তো রোজই ঘটে। তবে দেখার ফুরসত মেলে কই? বিশেষ কোনও সময় এলে নিত্যপ্রবহমান রোজনামচাই নিজে থেকে যেন নতুন

করে ধরা দিয়ে যায়। তখন মনে হয়, এমন ভালো বুঝি আজকের দিনের জন্যই। অনেকটা এই গঙ্গার মতোই। রোজই সে পাপ ধুয়ে চলে। তবু আজকের বিশেষ দিনে পাপস্খালনের কী বিচিত্র হিড়িক। সূর্যের গায়ে এখনও টুকরো মেঘ জাপটে আছে। ডিজি ক্যামে কটা যে ছবি বন্দি করলাম খেয়ালই করিনি। একটু দূরে আরেকটি নৌকোয় বিদেশি-বিদেশিনীর দল। বাপ্‌রে, সেই কোন সাত সাগরের পার থেকে তেনারা ছুটে এসেছেন ঘিঞ্জি বারাণসীর উৎসবকে স্বচক্ষে দেখবেন বলে আর এদেশের লোক হয়ে আমিই কয়েকদিন আগে অব্দি গঙ্গামহোৎসবের কথা জানতামই না। কথা ছিল ভাইকে সাথে করে বারাণসী ঘুরব। উৎসব-টুৎসব তখন কোথায়! এমন সময় সুপ্রতিমদা বলল এই মহোৎসবের কথা। এমনকি কালকে রাতে ওর ফোনটা যদি না আসত তাহলে এই সাতসকালে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে মেখে মাহেন্দ্রক্ষণে গঙ্গার বুকে ভেসে শত পুণ্যার্থীর আনন্দস্নান দেখা হত না।

কিন্তু এতক্ষণে সূয্যিমামার পুরোপুরি ঘুম ভেঙেছে। গঙ্গাবুকে আলতো আলতো ঢেউ তুলেছে দিনের আলো। আমরাও মীরঘাট, ললিতা ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি। সামনের ঘাট বরাবর চোখটা আটকে গেল। আবারও গঙ্গাস্নানের ছবি। তবে এ স্নান গঙ্গার বুকে শেষবার স্নান করে সূর্যের ডুবে যাওয়ার মতো। চারজন মানুষের হাতে এক নিথরপ্রাণের শুয়ে থাকা। ভিড় ঠেলে তাকে জলে নামতে হয়নি। বরং পরম শান্তিতে নিরিবিলিতে গঙ্গার জলে সর্বাঙ্গ ধুয়ে নিচ্ছেন। ওই চারটি মানুষ ধুয়ে দিচ্ছে ঘুমন্ত শরীরটাকে। ঘাটেই সাজানো আছে কাঠের শয্যা। একটুবাদেই প্রচণ্ড উত্তাপে জীবনের সব জ্বালা জুড়োবে ওই মানুষটার। পাঁচ-ছয় হাত দূরেই পুণ্যকামী আরএকজন প্রাণহীন মানুষটাকে ছুঁয়ে আসা গঙ্গাকেই মাথায়-মুখে-বুকে ছিটিয়ে নিচ্ছেন। পুজোয় বসবেন বোধহয়। তাই তার আগে একটু শুদ্ধিকরণ। গঙ্গাকে পতিতপাবনী বলে জানতাম। তবে তাঁর সেই রূপ আমার সামনে যে এইভাবে এসে ধরা দেবে ভাবতে পারিনি। যে ঘাটে এত সব কান্ড, তার নাম মণিকর্ণিকা। আজ এটা শ্মশান। ঘাটের উঁচু অংশে এক চিলতে আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলতেই থাকে। কোনও দিন নাকি নেভে না। তবে এর পেছনেও গল্প আছে। এই ঘাটটার আসল নাম রাজবল্লভ শ্মশানঘাট। তেমন একটা পরিচিতি ছিল না। এরই পাশে মণিকর্ণিকার ঘাট। এই শ্মশানের পরিচিতির জন্য মণিকর্ণিকার নামেই নাম হয় মণিকর্ণিকা মহাশ্মশান। রাজবল্লভ নামটা কীভাবে যেন মুছে যায়। নাকি ভেসে যায় কালগঙ্গায়।

www.amaderchhuti.com

ভেসে আসি সিন্ধিয়ার কাছে। কারুকার্যময় একচুড়ো মন্দিরটি বুক ডুবিয়ে হেলে আছে গঙ্গার কোলে। গোয়ালিয়রের রানি বৈজাবাঈ মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই এই ঘাট বাঁধাতে শুরু করেন। এমন শুভ কাজের আড়ালে তাঁর মনে ক্রমে বাসা বাঁধে চোরা অহংকার। মাতৃঋণ বলে তাঁর জীবনে আর কিছুই নেই। অমনি ডুবে যায় মাতৃস্মৃতিমন্দির। আজও সেই একইভাবে হেলে আছে জলের বুকে। ভোরের আলো হয়তো তাকে সান্ত্বনা দিতে চায়।

বুকান হঠাৎ আমার হাত থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নেয়। কী আবার চোখে পড়েছে কে জানে...। ওমা, এ কী কাণ্ড! ঘাটে বাঁধা নৌকার মাথায় একটা শালিকের নিঃসঙ্গ বসে ইতিউতি চাওয়া। গুণধর ভাই আমার তারই ছবি ক্যামেরা বন্দী করছে। বলি অনাসৃষ্টিরও তো একটা শেষ আছে নাকি! সাত সকালে এক শালিক দেখলে লোকে চোখ বোজে। আর উনি তাকে ছবিতে ধরে রাখছেন। যত্তসব অলক্ষুণে কাণ্ডকারখানা। ‘এই ক্যামেরাটা দে’।

দেখতে দেখতে সঙ্কটা, ভোঁসালা, গণেশ, গঙ্গামহল -এসব ঘাটও একে একে পেরিয়ে গেলাম। হঠাৎই চোখে পড়ল মসজিদের চূড়া। মাঝি বলল, ওটা আলমগীর মসজিদ। পাশেই রামঘাট। দিব্যি আছে। একসময় তাও চোখের ডানদিক থেকে বাঁদিকে সরে গেল। সেই মানমন্দির ঘাটের পর যেকটা ঘাট পেরোলাম একটাতেও উৎসবের ভিড় চোখে পড়ল না। দূরের ঘাটে আবার সেই ভিড়ের ছবি। ওটাই পঞ্চগঙ্গা ঘাট। আসল উৎসব নাকি এই ঘাটকে কেন্দ্র করেই হয়। কাছে আসতে লক্ষ্য করলাম এখানে মহিলাদের ভিড়ই বেশি। আবারও সহায় হল মাঝিভাই। বলল, এনারা একমাস ধরে এই ঘাটে এসে স্নান করেন। আজ তার শেষ দিন। ইসলাম ধর্মেও রোজাকে ঘিরে এমনই একমাসের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রথা আছে। কত মিল। তবু অন্তরের টানে এত যে কেন খামতি!? অবশ্য ব্যাতিক্রম আছেই। মানবজীবনের বেঁচে থাকার জন্য আজ ওই ব্যাতিক্রমটুকুই সম্বল। যাইহোক, এই ঘাটের নাম পঞ্চগঙ্গা হবার একটা কারণ আছে। এখানে ধূতপাপা, যমুনা, কিরণা ও সরস্বতী-এই চারটি উপনদী গঙ্গায় এসে মিলিত হয়ে চার আর একে পাঁচ হয়েছে। তাই এটা পঞ্চগঙ্গা। শুধু তাই নয়, পঞ্চগঙ্গা ঘাট পঞ্চতীর্থের চতুর্থ তীর্থ ও কাশীর একটি জাঁকজমকপূর্ণ ঘাট।

ঘাটের কাছাকাছি আসতেই নৌকোটা ধীর হয়ে গেল। সদ্য শীতের কনকনে জলে শয়ে শয়ে নারীদের মাহেন্দ্রস্নান।

যদিও সূর্য এখন মাঝ আকাশের পথে। তবুও দূরের রাজঘাট ব্রিজটা এখনও আবছা কুয়াশার আধারে। দুয়েকটা ডুব দিয়ে হাত জোড় করে সূর্যস্তবে জবাকুসুমের ফুটে ওঠা। পাশেই হাতে রাখা পিতলের ছোট্ট ঘট থেকে দুধ আর গঙ্গার একসাথে উপচে পড়া গঙ্গারই বুকে। কেউ বা সপসপে ভেজা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ঘাটের পাশের ধাপটায় আপন মনে ঘুরে চলেছেন দশদিক প্রদক্ষিণ করে। মুখে অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ। চার-পাঁচ বছরের শিশুও বাদ পড়েনি এই পুণ্যের ভাগ থেকে। মায়ের কোলে কেঁদেই চলেছে। ওর মা হয়তো মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে চলেছেন, 'নমো কর, ঠাকুর তো। এই জলে চানু করলে যা চাইবে তাই পাবে'। ললিপপ কিম্বা কম্পিউটার গেম দেবার ক্ষমতা মা গঙ্গার আছে কিনা জানি না, তবু মা গঙ্গার কাছে একটাই মিনতি, ওইটুকু দুধের শিশুকে নিমুনিয়া অথবা ব্রঙ্কাইটিস উপহার দিও না মা গো।

নৌকো এবার উল্টোপথে। পঞ্চগঙ্গা থেকে দশাশ্বমেধের দিকে। মা গঙ্গা এখন নীলাম্বরী ছেড়ে গলানো কাঁচা সোনার রঙে সেজেছে। আলোয় আলোয় ওপারের চরও ভেসে যাচ্ছে। দূরের নৌকোগুলো কী বিচিত্র শোভায় সূর্যকে অতিক্রম করে ভেসে চলেছে এধার থেকে ওধারে। ছবিটা না তুলে আর থাকতে পারলাম না। এদিকে জলের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা গোল গোল চবুতরাগুলোতে এক এক করে সাধুরা এসে ভিড় জমাচ্ছেন। কেউ দর্পণে চোখ রেখে কপাল জুড়ে তিলক এঁকে নিচ্ছেন। ধীরে ধীরে আবার মানমন্দির ঘাট, পাশেই দশাশ্বমেধ এবং তারপর প্রয়াগ ঘাট। উষাকালের শত শত মানুষ কখন যেন হাজারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কত হাজার বলা মুশকিল। গঙ্গা থেকে ঘাটটাকে দেখতে চাইলে কেবল মানুষের মাথার মিছিলই চোখে পড়ে। পৃথিবীর যত রং সব যেন পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গার কোলে উপচে উঠেছে। কেউ হাঁটুজল, কেউবা বুকজলে পুণ্যার্জনে ব্যস্ত। আচারে-বিচারে, পূজার্চ্চনায় কেবল ধর্মেরই প্রতিফলন। কিন্তু উৎসব! সে তো লক্ষ মানুষের মনে-মননে-ভাবনায়-চেতনায়।

মানমন্দির ঘাটের বাজারের মধ্যেকার রাস্তাটা তুলনামুলক তবুও একটু খালি। সেখানেই সারে সারে সাপ-সাপুড়ের মেলা। আজব খেলা। সেদিন সোমবার বলে ওদের হাঁকডাকের জোরটা যেন আরও একটু বেশি। বাবার অঙ্গভূষণ এড়িয়ে গোধূলিয়া মোড়। তারপর সেখান থেকে আবার চেতগঞ্জের দিকে। রাস্তা থেকে জলখাবারের ব্যবস্থাটা করেই ফিরলাম। বাতাসার মতো চারটে কচুরি সঙ্গে কালো রঙের ঘ্যাঁট -দাম দশটাকা। নিলে নিন, নইলে পথ দেখুন। আজ খাবার বিক্রেতাদের রেলাই আলাদা। অগত্যা যা পাওয়া যায়। খেয়েও মুশকিল, ওই খাবারের যেটুকু পেটে গিয়েছিল সেটুকুও প্রায় উগরে দেওয়ার মত অবস্থা। তবে অন্যসময় অবশ্য বেনারসের কচুরি যদি ঠিকঠাক জায়গা থেকে কিনে খাওয়া যায় তাহলে তার স্বাদই আলাদা।

www.amaderchhuti.com

প্রায় তিনদিন কেটে গেল বেনারসে। আমাদের আসার আগের দিন থেকে গঙ্গামহোৎসব শুরু হয়েছে। বড় বড় রাস্তা থেকে গলি-তস্যগলির চেহারাই গেছে বদলে। গত দুদিন আমাদের ট্যুর প্ল্যান যাই থাকুক না কেন বিকেল হলে নিয়ম করে গঙ্গার ঘাটে ঠিক হাজির হতাম। দশাশ্বমেধের বুক ছোঁয়া চবুতরায় দাঁড়িয়েই কেটে যেত সময়ের পল-অণুপল গুলো। দেখতাম কেমন বিকেল থেকেই শুরু হয়ে যায় সন্ধ্যাবরণের প্রস্তুতি। পর্যটকদের নৌকোগুলো যখন একে একে ঘাট ভ্রমণ সেরে ঘাটে এসে লাগে তখন থেকেই গঙ্গাবুকে প্রদীপ-ভাসান খেলা। একটি-দুটি থেকে দশ-বারোটা, তারপর আরও...আরও, শিখায় শিখায় সেজে ওঠেন মা গঙ্গা। পুণ্যকামী মানুষগুলোর পেছনে, আশেপাশে ফটোগ্রাফারের পারফেক্ট ফ্রেম খোঁজার ব্যস্ততা। যার ছবি যত ভালো, তার দাম তত বেশি। যার যেখানে পুণ্য আর কি! বলাই বাহুল্য, আমিও ওই ছবি সন্ধানীদেরই দলে তবে স্রেফ মনের আনন্দেই।

ঘাটের নীচে তখনও অনেক প্রদীপ জ্বলবার অপেক্ষায়। ওপরটাতে দাঁড়িয়ে থাকা উড়ন্ত জীবনের ছেলেগুলোর হাতে ঘুড়ির সুতোয় তখনও বেশ টান। আঁধার-আলোর সন্ধিবিকেলে চাঁদটা প্রায় থালার মতো। দুয়েকটি নৌকো ভেসে বেড়াচ্ছে মাঝগঙ্গায়। এদিকে দশাশ্বমেধ ঘাটে আরতির আয়োজন পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎই ঘাড়ের ওপর সুড়সুড়ি। কাটা ঘুড়ির সুতো। মাইকে সেই কখন থেকে বাংলা আর হিন্দিতে সতর্কবাণী। সঙ্গে দশাশ্বমেধের মাহাত্ম্য। কাশীখণ্ডে বলা হয়েছে, রাজা দিব্যদাস এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করেন। তাই শিব এখানে ব্রহ্মেশ্বর। এ তো গেল পুরাণের কথা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জয়সওয়ালজি বলেছেন, ভারশিব নামে জনৈক নাগনৃপতি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে এখানে পর পর দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। আর তারপর থেকেই এই পবিত্র যজ্ঞস্থলের নাম হয় দশাশ্বমেধ।

পুরাণ-তর্ক শিকেয় তুলে আজ আপাতত দুই আনকোরা উড়ো পথিকের আবার পথে নামা। গন্তব্য? কোথায় আর,

দশাশ্বমেধ। আজই তো মহোৎসবের মহালগ্ন। এই উৎসবের আরও একটা নাম আছে। খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল চেতগঞ্জের হোটেল থেকে গোধূলিয়া মোড়ের দিকে আসার সময়। রাস্তার আশেপাশে ছোট ছোট মন্দির, বাড়ির উঠোন, দোকানপাট সবই আজ দীপালোকে প্রজ্জ্বল্যমান। সারে সারে প্রদীপের ভিড়ে অন্ধকার নামার আগেই সে যেন আজকের মতো হারিয়ে গেছে কোন গহনে। তখনও সন্ধে নামেনি। আকাশখানা দখল করে নিয়েছে আলোর বাজি। আজ যে দেবতার দীপাবলি। তাই এর আরেক নাম দেবদীপাবলি। মানুষ তার দীপাবলি জ্বালায় অমাবস্যার রাতে। ঠিক তারই পনেরো দিনের মাথায় ভুবন যখন পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ভাসে, তখন ঈশ্বর তাঁর অঙ্গনে জ্বালান দীপ্তদীপের শিখা। দূ-রে, ওই পারে, যেখানে আরতির আলো পৌঁছয় না সেখানে চাঁদের আলোয় চর ভেসে যায়। এপারের চরাচরে তখন বৈদিক মন্ত্রে মঙ্গলগান, শঙ্খনিনাদ, ঘন্টাধ্বনি, ডমরুবোল, ধুনোর ধোঁয়া। দশাশ্বমেধে পরপর সাজানো পূজাবেদির ওপর দাঁড়িয়ে সাতযুবাকণ্ঠের শিবস্তুতি, গণেশবন্দনা, গঙ্গাভজন এমনকি শিবতান্ডব স্তোত্রও ফিরে আসে সৃষ্টির সূচনা নিয়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের চাওয়া মিশে যায় একসাথে -ওই এক আরতির শিখায়। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম পুণ্যারতির আলো বৃত্ত আঁকে। লক্ষ্য আত্মার সুপ্তবাণী যেন ছুটে যায় ভূমণ্ডলের গানে। পাশেই মঞ্চ বেঁধে চলছে ধ্রুপদী সংগীত, নৃত্য আর ঈশ্বর ভজনার স্তব। সেখানেও লোক জড়ো হয়েছে প্রচুর। আজ তিলধারণের জায়গাটুকুও নেই। ঘাটের পাশে উঁচু মতন অংশটাতে, হতে পারে কারো বাড়ির ছাদে বড় বড় ক্যামেরায় দক্ষ রিপোর্টার, লাইভ টেলিকাস্ট চলছে। ঘাটের সামনের গঙ্গাও যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। যত দূর চোখ যায় ততদূরই মানুষ আর মানুষ। অন্যান্য দিন দশ টাকার বিনিময়ে নৌকোয় বসে আরতি দেখার সুযোগ মেলে। আজও তার ব্যাতিক্রম নয়। তবে ভাড়াটা নির্ঘাৎ দশটাকায় আটকে নেই। আজ আরতির প্রদীপ্ত শিখারাশির সঙ্গে মিশে গেছে আনন্দবাজির রং-উল্লাস। ধনী-নির্ধনে একাকার এই ভিড়। পাশের মঞ্চে কত্থকের বোলে ঝড় তুলেছে কোনও এক ক্ষুদে নর্তকীর পা। ঘাটে ঘাটে আলোর প্লাবণে ভেসে যাচ্ছে প্রাচীন বারাণসী। ঘন্টাখানেকের আরতি এখন শেষ। তবু মানমন্দির, দশাশ্বমেধ আর প্রয়াগ ঘাট জুড়ে ঐশ্বরীয় আমেজের মহোল্লাস। বহু দূরে পঞ্চগঙ্গা-ও বোধহয় এমনই আনন্দে মেতেছে।

আজ ভোরে যে লক্ষ পায়ের মিছিল বিভিন্ন গলি -তস্যগলির গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজপথে মিশে গঙ্গার জল স্পর্শ করেছিল, সেইসব চেনা-অচেনা ধুলো-কাদামাখা পাগুলোই আলোর রাজপথ ডিঙিয়ে ফিরে চলেছে অন্ধগলির অন্ধকারে। গঙ্গার তরঙ্গে হাজার হাজার প্রদীপ শিখা ভেসে চলেছে। কোথায়? কাকে আলো দেখাতে? যে নিজেই কোটি সূর্যের কিরণে উদ্ভাসিত! নাকি যারা একটুখানি আলোর জন্য মা গঙ্গার কাছে দুহাত পেতেছিল !?

www.amaderchhuti.com

দুদিন আগে ভরদুপুরে গঙ্গার বুকে ভাসতে ভাসতে দেখা একটা ছবি ভেসে উঠল চোখে-ঘাটে বাঁধা নৌকোর মাঝিটা তার হাল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জলের মধ্যে খোঁচাচ্ছে। আমাদের নৌকো খানিকটা এগোতে কৌতুহল আরও বাড়ল। সাদা মতন কী একটা যেন উঁচু হয়ে জলে ডুবে আছে। ওই মাঝি সেটাকেই তোলার চেষ্টা করছে। -উও ক্যায়া হ্যায় সুরেশ ভাই? উধর?

সুরেশ মানে আমার মাঝির নির্লিপ্ত উত্তর, 'উও? উও তো বডি পড়া হ্যায়। কিসিনে মারকে ফেক দিয়া' -যেন কোনও ব্যাপারই না। ঘাটে দুয়েকজন লোক আর কয়েকটা কুকুরের ভীষণ ব্যস্ততায় ছুটোছুটি। উল্লাসে! ভাই প্রশ্ন করল-'ইধর পুলিশ-টুলিস নেহি হ্যায়?' থাক, সুরেশ মাঝির উত্তরটা বরং আমার কলমের আঁচড়েই সেন্সর হোক। নইলে গোল বাঁধতে পারে।

আমার ভাইয়ের হাতের প্রদীপটাও আস্তে আস্তে ভেসে গেল কালো গঙ্গার জলে। ঘাটছোঁয়া সেই জল সবেমাত্র মাথায় ছেটাতে যাবে, ধমকে উঠলাম-'আঃ, অনেক হয়েছে। ওঠ তো। নোংরা জল আর মাথায় ঠেকাতে হবে না'।

আমি চাই না, শুধুমাত্র নিজের পুণ্যের জন্য আমার ভাই কারও চোখের জলে নিজেকে ধুয়ে নিক...।

☐ তথ্য- বেনারস (উত্তরপ্রদেশ) ☐ || ☐ বেনারসের ছবি ☐

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

পবিত্র হ্রদের তীরে

শীলা চক্রবর্তী

☐ তথ্য- গুরদোংমার হ্রদ (সিকিম) ☐|| ☐ গুরদোংমার হ্রদের ছবি ☐

দূরের পাহাড়ে হাতছানি আধো-নীলিমার। চোখের সীমানায় পাহাড়ের গাঢ় সবুজ গালিচা। আকাশ আড়াল করা উচ্চতা। কোথাও স্ট্রবেরির ঝোপ। পার্সিমামের ঝাড় কোথাও। হঠাৎ কোথাও পাহাড় থেকে নেমে আসা চঞ্চল ঝরনা ভিজিয়ে দিচ্ছে পথ। সুন্দর ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম, নামটিও ভারি মিষ্টি – রংপো -সিকিমের প্রবেশপথ। আমাদের গন্তব্য পূর্ব সিকিমের ১৭,৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত টলটলে জলের হ্রদ গুরদোংমার। রংপোর রাস্তাঘাট চওড়া, মসৃণ। রংবেরং এর রাফট বোট নিয়ে দলে দলে লোক চলেছে বর্ষার ভরা উত্তাল তিস্তায় রাফটিং করবে বলে। হেঁটে - গাড়িতে। তিস্তার বুকে রঙিন রঙিন বোটগুলো চলছে হেলতে দুলতে। পথে গাড়ি থামিয়ে চা বিরতি। পাহাড়ি ছাগল চরছে ইতিউতি। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক পৌঁছতে রাত।

www.amaderchhuti.com

পরদিন সকালে একটি স্থানীয় গাড়ি ভাড়া করে চললাম লা-চেন। আগাম অনুমতি ছাড়া গ্যাংটক ওপাশে ভিন রাজ্যের গাড়ির প্রবেশ মানা। পথের কত সুন্দর সুন্দর পাহাড়ি ঝরনা বাহারি তাদের নাম! নাগা বচ্চন ফলস্ - ঝরনার সু-উচ্চতার কারণে এই নাম। সুন্দর রোদ ঝকমকে দিন, হঠাৎ ঘনিয়ে এল মেঘ নিয়ে এল বৃষ্টি কুচি ভরা হাড়হিম ঠান্ডা হাওয়া। সামনের দৃশ্য ঢেকে গেল। গাড়ির হেডলাইট। কিছুক্ষন পরই আচমকা মেঘ সরে হেসে উঠেছে বৃষ্টিভেজা প্রকৃতি। এমনই সরল আলো ছায়ার খেলা পাহাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চটকা ভাঙলো ড্রাইভারের ডাকে -ম্যাডাম, ম্যাডাম, দেখিয়ে, ইয়াক...। তাকিয়ে দেখি রাস্তায়, নীচের উপত্যকায় চরছে অসংখ্য চমরি গাই। পোষা, নিরীহ। ছবি তুললাম ঝটপট। স্থানীয় বাজারে এই ইয়াকের দুধে তৈরি জমাট একধরনের কিউব পাওয়া যায়। রবারের মতো শক্ত, স্বাদহীন। চিবিয়ে নরম করা প্রায় অসাধ্য। স্থানীয় ভাষায় একে বলে ছুরপি। লা-চেন পৌঁছতে সন্ধে। হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে দু-দুটো কম্বলের নীচে ঢুকে পড়লাম দ্রুত। অসম্ভব ঠান্ডা। তুমুল গ্রীষ্মেও জলের স্পর্শে হাত - আঙুল অসাড়।

পরদিন সকাল সকাল ইয়াকের দুধের বিস্বাদ গলানো মাখনে ভেজা গোবদা পাঁউরুটি খেয়ে যাত্রা করলাম গুরদোংমার। পাহাড়ি পথ আর ঝরনার ক্লান্তিহারা সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম তিব্বত সীমান্তের কাছে ভারতের শেষ সেনা ছাউনিতে। হাত তুলে সামনে এক জওয়ান। গাড়ির কাচ নামলো। জওয়ান বললেন উতরিয়ে - কুছ্ নাশ্‌তা পানি দেনা হ্যায়। হঠাৎ মেরুদণ্ডে ঠান্ডা স্রোত...নাশ্‌তা পানি মানে? নির্ঘাৎ এই জনবিরল প্রান্তরে নামিয়ে ধোলাই দেবে এবার। আমার বিবর্ণ মুখ দেখে ভাবনাটা পড়ে ফেললেন জওয়ান। হেসে বললেন- ডরিয়ে মত্, আজ বাবা কা ডে হ্যায়.....। ধড়ে প্রাণ এলো। নামলাম। গরমাগরম চা, গ্লুকোজ বিস্কুট, সসে ডোবানো চমৎকার মুচমুচে ফুলকপির পকোড়া, লাল রঙের গরম শরবত দিয়ে আন্তরিক আপ্যায়ন করলেন ওঁরা। আফশোস হচ্ছিল কেন সকালে গোবদা পাঁউরুটি খেলাম - নাহলে এই চমৎকার পকোড়া বেশ জমিয়ে খাওয়া যেত....।

জওয়ানদের সাথে ছবি তুললাম আমরা। ওঁদের মুখেই শুনলাম - সিকিমের জওয়ানদের জীবনযাত্রার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা কিংবদন্তী সেনা অফিসার বাবা হরভজন সিংহের রহস্যময় সব কাহিনি। বহুকাল আগে রহস্যময় ভাবে নিখোঁজ হওয়া এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেনা অফিসারটি এখনো জীবিত বলেই প্রচলিত বিশ্বাস জওয়ানদের। প্রতি শীতে, ঐ অঞ্চল যখন জনশূণ্য, বাবা তখন ছুটিতে যান বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁর থাকবার ঘর, ব্যবহারের পোশাক ও জিনিস-পত্র সেনাব্যারাকে সাজিয়ে রাখা আছে। মনে করা হয় তিনি আজও সেসব ব্যবহার করেন। তিব্বত সীমান্তের এই অতন্দ্র প্রহরী নিজের কর্তব্য বিষয়ে খুব কড়া। অন ডিউটি কোন সেনা যদি সামান্য ঝিমিয়েও পড়েন- সশব্দে চপেটাঘাতে তাঁকে জাগিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে থাকেন বাবা। যাহোক, আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। পথটি এবার বেশ সরু। সীমান্তবর্তী পথের দুধারে ল্যান্ডমাইন পোঁতা আছে বলে সতর্ক ড্রাইভার দাওয়া শেরপা। উচ্চতার কারণে অঞ্চলটি বৃক্ষহীন, ধূসর। হঠাৎ হঠাৎ বাঁক নিয়েছে সরু পথ। গাছ গাছালি নেই, তাই পাহাড়গুলোও ন্যাড়া। কী অপার, অপার্থিব তাদের সেই অনাবৃত, উদ্ভাসিত সৌন্দর্য! কোনটা ইঁটের মত লালচে, কোনটা আকাশের মত নীল, কোনটা ছাইরঙা, কোনটা ধূসর, কোনটা সোনালি- মাথায় সব বরফের পুরু মুকুট। ঝকঝকে মেঘহীন প্রান্তর- সেই ঐশ্বর্য্যময় তুষারকিরীট ঝকমক করছে সূর্য্যকিরণের ঠিকরে পড়া আশ্চর্য বর্ণচ্ছটায়। আকাশ ঘন নীল, টুকরো পাতলা সাদা মেঘ লেগে আছে কোথাও। এই অনাবিল সৌন্দর্য্যের মধ্যিখানে বাক্যহারা আমার স্মরণে হঠাৎ - পারস্যের বিখ্যাত শায়র শেখ সাদীর একটি রুবাইয়াত –

অগর্ ফিরদৌস্ বার্ রু এ জমিন্ অস্ত্ -ও হমিন অস্ত্, ও হমিন অস্ত্, ও হমিন অস্ত্।

স্বর্গ যদি থেকে থাকে পৃথিবীর কোনোখানে -তবে তা এইখানে, তা এইখানে, তা এইখানে...।

অপার বিস্ময়ে স্তব্ধ। পলকহীন চোখের আবেশ নিয়ে পৌঁছে গেলাম গুরদোংমার হ্রদ। এখানে রয়েছে শিখ ধর্মের পথিকৃৎ ওয়াহি গুরু নানকজির মন্দির। মন্দিরে ওয়াহি গুরুজির মূর্তি রয়েছে। মন্দির চত্বরে ঝুলছে অসংখ্য লুংদার (তিব্বতী ভাষায় ভূত বা অপবিত্র আত্মা তাড়াবার মন্ত্র লেখা রংবেরং এর ছোট পতাকা)। পাশেই ছোট হ্রদটি। শান্ত, তিরতিরে, স্বচ্ছ, নাতিগভীর, চোখজুড়ানো নীল। কথিত আছে, এই অঞ্চলে দীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন তপস্যার শেষে গুরু নানক স্নানশুদ্ধ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পুরু বরফাবৃত এই প্রান্তরে কোথায় জল? তখন তিনি হাতের ছড়ি দিয়ে এই হ্রদের জমাট বরফে আঘাত করে, বরফ ভেঙ্গে, জল পান ও স্নানে তৃপ্ত হন। তিনি এই হ্রদটিকে আদেশ করেন, যেন হ্রদটি চিরকাল এই তুষারাবৃত প্রান্তরে ক্লান্ত পথিককে জলদান করে এবং কখনো নিজের শরীরে বরফ জমতে না দেয়। সুতরাং, চতুর্দিকের পাহাড়গুলো পুরু বরফে আবৃত হওয়া সত্ত্বেও এই হ্রদে কখনো বরফ জমে না, সর্বক্ষণ এটি টলটলে। এটিই এই পুণ্য হ্রদের মহিমা। স্থানীয় ভাষায় দোং অর্থ ছড়ি বা লাঠি। ওয়াহি গুরুজি এই হ্রদের বরফ ভেঙ্গেছিলেন ছড়ি দিয়ে - তাই এই পবিত্র হ্রদের নাম গুরদোংমার।

ভারত-তিব্বত সীমান্তটি এখান থেকে দৃশ্যমান। যেহেতু এখানে অক্সিজেনের বেশ অভাব তাই কয়েক মিনিটের বেশি কারুর এখানে থাকবার অনুমতি নেই। তাই যথাসম্ভব দ্রুত মন্দির দর্শন ও ছবি তোলা শেষ করে হিহি শীতে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির পেটে ঢুকে পড়লাম। রীতিমতো শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। ইনহেলার নিতে হলো।

ফেরার পথে আমরা গেলাম চোপ্‌তা ভ্যালি, বাবা হরভজন সিংহের শীতকলীন আবাস। চারদিকে ছড়ানো উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ। সেই রংবেরঙের রডোডেনড্রনের আমেজ আর চমরি গাই এর গন্ধভরা বাতাসে বুঁদ হয়ে লাচেন ফেরার পথ ধরলাম। পরদিন গ্যাংটক হয়ে শিলিগুড়ি। অতঃপর কলকাতা ফেরার পালা।

মন বেশ খারাপ, ইস্, আরো ক'টাদিন থাকা যেত যদি ! আবার আসতে হবে এই মায়াবী সৌন্দর্যের টানে, কথা দিলাম। মনের মনিকোঠায় অক্ষয় হয়ে রইল অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর রূপকথার আধার, গুরু নানকের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র হ্রদ গুরদোংমার।

☐ *তথ্য- গুরদোংমার হ্রদ (সিকিম)* ☐ || ☐ *গুরদোংমার হ্রদের ছবি* ☐

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu - Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

জলসই

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

☐ তথ্য- রম্ভা (ওড়িশা) ☐ তথ্য- গোপালপুর (ওড়িশা) ☐

☐ ছবি - রম্ভা || ছবি- গোপালপুর ☐

দূরে রেড ক্রেস্টেড পোচার্ডের একটা বড় ঝাঁক জলের ওপর ছড়িয়ে বসেছিল। মনে হচ্ছিল কালো জলের ওপর কে যেন হাল্কা রঙের একটা চাদর বিছিয়ে রেখেছে। সাদা-কালোয় মেশানো শরীর আর ডানা, লালচে হলুদ রঙের ঠোঁট আর পা নিয়ে অনেকটা বড়সড় হাঁসের মত চেহারা। মোটরবোটের একটানা বিশ্রি আওয়াজটা কাছে আসতেই চাদরে টান পড়ল। আওয়াজ থেমে গেলেও ওরা টের পাচ্ছিল আমাদের উপস্থিতি। চঞ্চল হয়ে উঠছিল। মাঝে মাঝেই ঝাঁক থেকে কয়েকটা পাখি উড়ে গিয়ে আকাশে চক্কর খেয়ে আবার ঘুরে এসে বসছিল। মোটরবোটের মুখটা ঘুরিয়ে আবার রওনা দিতেই বুড়ো আংলার হাঁসের দলের মত ঠিক যেন রিদয়কে নিয়ে একঝাঁকে উড়ে গেল পাখিগুলো।

www.amaderchhuti.com

শীতের সময় সুদূর সাইবেরিয়া, ইরান, মধ্য এশিয়ার নানান দেশ থেকে ফ্লেমিংগো, পেলিকান, সোনালি টিট্টিভ, সিন্ধু ঈগল প্রভৃতি হাজারো পাখি ভিড় জমায় চিল্কার বুকে। একত্রিশে ডিসেম্বর বিকেলে হাল্কা শীতের আমেজ গায়ে মেখে আমরাও যেন পরিযায়ীর দল, ভেসে পড়েছি চিল্কায়।

উঁচু পাড়ের গায়ে অগভীর জলে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে নৌকো আর মোটরবোটগুলো। ঘাসজমিতে আর জলের মধ্যে জেগে থাকা মাছধরার জালের গায়ে ইতিউতি বসে স্থানীয় আর অতিথি পাখিরা। কোথাও দল বেঁধে, কোথাওবা একলাই। ভোরবেলায় এরা দলে আরও ভারি ছিল। জলাজমির ঘাসে মুখ ঢুকিয়ে শিকার খোঁজে বক আর মাছরাঙার দল। কমন স্যান্ডপাইপারের কাজলটানা চোখদুটো দেখতে ভারি ভালোলাগে।

সমুদ্রের কোলঘেঁষা বলেই হয়তো চিল্কার জলে কোথাও একটা সীমাহীনতার ছোঁয়া রয়েছে, অথচ পাড়, জলের বুকে জেগে থাকা টিলাগুলো সবই সীমানির্দেশ করে। জলের ধারে রম্ভা পান্থনিবাসের বারান্দায় বসেই হ্রদের বুকে ওয়াচটাওয়ারটা নজরে পড়ে। টাওয়ারটা দেখতে মন্দিরের মাথার মত। জলের মধ্যে ছোট্ট একটা ঘর, মোটরবোট থেকে সিঁড়ির প্রথম ধাপে নেমে আরও দুটো সিঁড়ি ভেঙে ঘরের মধ্যে যাওয়া যায়। ওয়াচটাওয়ার থেকে কিছুটা এগিয়ে একটা টিলার গায়ে থামল মোটরবোট। টিলার ওপরে গুহায় শিবমন্দির। এবড়ো খেবড়ো পথে টিলার গা বেয়ে উঠে যায় দলের বাকিরা। জলের বুকে নৌকায় একা বসে থাকি। শেষ বিকেলের আলোয় দিগন্ত আর জলরাশি রাঙা হয়ে ওঠে।

দূরে টিলার মাথায় ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে বছর শেষের সূর্য। মায়াবী হয়ে ওঠে চারিদিক। একা একা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াচটাওয়ারের চারপাশে জল চিকচিক করে ওঠে। পাখির দল কোথাও জলের মধ্যে জেগে থাকা জালের গায়ে বিশ্রাম নেয়, কেউবা উড়ে চলে দিগন্তে।

রম্ভা থেকে গোপালপুরের রাস্তাটা সবটা খুব ভালো না হলেও এই অটোপথ ভালো-ই লাগছিল। রম্ভা থেকে বরকুল বেড়ানোর সময়ই অটোচালক রত্ন-র সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তার জোরাজুরিতেই ছোট্ট অটোতে যাবতীয় ব্যাগপত্তর ঠেসে বেরিয়ে পড়েছিলাম গোপালপুরের দিকে। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ি এলাকার মতো। উঁচু উঁচু টিলা কেটে চওড়া রাস্তা এগিয়েছে। পথের গা ঘেঁষে ছুটে যায় ট্রেন। আবার নীচু জমি জল-কাদা, ক্ষেতের পাশ দিয়ে নাচতে নাচতে চলে অটো। মনের আনন্দে একের পর এক গান গেয়ে চলে আমাদের দশ বছরের আর বন্ধুর আট বছরের মেয়ে। গান শেষ হতে না হতেই অটো এসে থামে ছোট্ট শহর পেরিয়ে একেবারে সমুদ্রের কাছে।

সমুদ্র বোধহয় ঠিক রূপসী নারীর মতো। তাকে যতই দেখা যায় আশ মেটেনা কিছুতেই। এত উচ্ছ্বল অথচ এত শান্ত। গোপালপুরে এসে বারবার আন্দামানের সমুদ্রের কথা মনে পড়ছিল। সাগরের অত রূপ আর কোথাও দেখিনি। ওখানে সে যেন রাজরানী। নীল-সবুজ বেনারসীতে চিরযৌবনা। আর এখানে যেন পাশের বাড়ির আটপৌরে বধূটি। আধখোলা ঘোমটার ফাঁকে শান্তসুন্দর মুখেই কখনও খেলে বেড়ায় রাগের ভ্রুকূটি।

হোটেলের ঘরের ঠিক সামনে কয়েকধাপ সিঁড়ি নেমে গেলেই একেবারে বালিতে। সমুদ্রসৈকতটা বেশ চওড়া। বেলা এগারটা-বারটা বাজে। জানুয়ারির প্রথমদিন। রোদ কিন্তু বেশ চড়া। দুপুরের ঝকঝকে রোদ নীল জলে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। বেলাভূমিতে তেমন ভিড় নেই। সমুদ্রস্নানে ব্যস্ত কয়েকজন। বালিতে অলসভঙ্গীতে শুয়ে-বসে আরও জনা কয়েক। দূরে জেলেরা জাল গোটাচ্ছে। জলে পা ভিজিয়ে হেঁটে বেড়াই সৈকতে। বেলাভূমিতে জাল ছড়িয়ে বসেছে জেলেরা। জালের গায়ে ছোটবড় অজস্র কাঁকড়া। কোনো কোনোটার পেটে আবার হলুদ বা কালো রঙের একগুচ্ছ ডিম। জালেরে ফাঁকে ফাঁকে আটকে রয়েছে কয়েকটা স্টারফিশ আর জীবন্ত ঝিনুক।

www.amaderchhuti.com

গোপালপুর শহরটা পুরীর মত জমজমাট নয়, আবার চাঁদিপুরের মত একেবারে নির্জনও না। বেশ মধ্যবিত্ত মেজাজ। বাজার এলাকাটা সমুদ্র থেকে খানিক দূরে। সমুদ্রের ধারে হোটেল আর রেস্টুরেন্ট ইতস্ততঃ ছড়ানো। ওড়িশার সাইক্লোনে গোপালপুরের কয়েকটা হোটেল বেশ ভেঙে গিয়েছিল। ভাঙা হোটেলের কাঠামোর গায়ে জমে উঠেছে বালির স্তূপ। জঙ্গল হয়ে গেছে আপন নিয়মেই। সমুদ্রের পাড়ে বিকেল-সন্ধেয় এই ভাঙা বাড়িগুলো কেমন রহস্যময়তার সৃষ্টি করে। উঁচু পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের ধারে একটা চাতালের ওপর বালিতে বানানো জগন্নাথের মূর্তি নজরে পড়ে। কে জানে কোন শিল্পীর সৃষ্টি!

হোটেলের সামনেই রাস্তার এপারে-ওপারে গোটা তিনেক গিফট শপ। আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁহাতে লাইটহাউস। সূর্য পশ্চিমে ঢলছে। পায়ে পায়ে পৌঁছে যাই লাইটহাউসে। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। অসাধারণ প্যানোরামিক ভিউ। দিগন্তবিস্তৃত নীল সমুদ্রে সাদা ঢেউ ভাঙছে। হলুদ বালিতে কমলা-হলুদ গার্ডেন ছাতার নিচে লাল রঙের চেয়ারের সারি আর রঙিন পোষাকে পর্যটকের দল। অস্তরাগের মায়াবি আলোয় অপরূপ হয়ে ওঠে দিগন্ত। অন্ধকার নেমে আসে।

লাইটহাউস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসি সৈকতে। গরম কফির কাপ হাতে বসে পড়ি সৈকতের ধারের বাঁধানো সিঁড়িতে। সমুদ্রের হাওয়ায় এখন একটা ঠাণ্ডা আমেজ। লাইটহাউসের আলো হারিয়ে যায় সাগরের বুকে। রাত বাড়তে থাকে.....।

ভোর বেলার সমুদ্র ভারী নরম। সূর্যের মিঠে আলো লাগে চোখেমুখে। পায়ের পাতা ছুঁয়ে যায় জল। সৈকতে সমুদ্রের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে লাল-নীল-সবুজ মাছ ধরার নাও। সাগরের বুকে ভেসে যায় আদরের নৌকো। রাত থাকতেই জেলেদের যে দলগুলো সমুদ্রে বেরিয়েছিল তাদের কেউ কেউ ফিরে এসেছে। তাদের জালে মাছ আর কাঁকড়ার স্তুপ। অদ্ভুত দেখতে একটা সাপও উঠেছে জালে। মুখটা অনেকটা মাছের মতন। সাপটাকে ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে জালে গেঁথেছে। ওটাই এবার টোপ হবে। বালির ওপর হাঁটতে হাঁটতে দেখি দুজনে মিলে কাঁধে কী যেন ঝুলিয়ে হেঁটে আসছে। কাছে আসতে দেখি ওরেবাবা এযে বিশাল এক শঙ্কর মাছ। মাছটাই একমানুষ সমান। লেজটাতো আরও বড়। রোদ উঠে গেছে। সৈকতে ফ্লাইং ডিস্ক ছুঁড়ে খেলছে আমাদের দুই বালিকা। এবার জলে নামার পালা, ডাক দিই ওদের।

বিকেলে সৈকত ধরে সাগরের গা ছুঁয়েছুঁয়ে হাঁটা। জেলেরা জাল বুনছে বেলাভূমির ধারে। মেয়ের সাথে ছুটে ছুটে ঝিনুক কুড়োই। হোটেল থেকে নেমে বাঁদিকে পায়েপায়ে অনেকটা চলে এসেছি। পিছনে তাকালে চোখ আটকায় লাইটহাউসে। আরও এগিয়ে একজায়গায় দেখি তিরতিরে জলধারা মিলিয়ে গেছে সাগরের বুকে। ঠিক যেন মোহনা। জল ভেঙে ওপার থেকে ফিরছে বিদেশিনী। সমুদ্রের বুকে সন্ধ্যা নেমে আসে....।

☐ *তথ্য- রম্ভা (ওড়িশা)* ☐ *তথ্য- গোপালপুর (ওড়িশা)*☐

☐ *ছবি - রম্ভা* || *ছবি- গোপালপুর* ☐

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

www.amaderchhuti.com

আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি...

সিদ্ধার্থ পাল

☐ তথ্য- এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেক (নেপাল) ☐ || ☐ এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের ছবি ☐
☐ এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেক রুট ম্যাপ ☐

তালুর উর্ধ্বে এভারেস্ট। প্রায় আকাশ অবধি। উদ্ধত, অহংকারী। সুন্দর এবং রহস্যময়। একা এভারেস্ট নয়, আরও অনেকে। তবে আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য অন্যান্য শৃঙ্গগুলি মেঘের চাদরে ঢেকে রয়েছে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে ৩৬০ ডিগ্রি জুড়ে পুমোরি, লিনট্রেন, খুম্বুৎসে, লোলা, চ্যাঙৎসে, ওয়েস্ট সোলডার, সাউথকল, লোৎসে, নুপৎসে আর একটু দূরের আমাদাবলাম, কাঙটেগা, চোলাৎসে, তাওচে প্রভৃতি। তবে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাও সহজে ভোলবার নয়।

www.amaderchhuti.com

চারপাশে প্রচুর বিদেশি। সবাই ঝিনচ্যাক ডি.এস.এল.আর, বায়নোকুলার, জি.পি.এস. হাতে। তবু দুচোখে এ দৃশ্য উপভোগ করছে, আমরাও। আমরা মানে আমরা আটজন ভেতো বাঙালি। কলকাতা উত্তর। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯-এ মিথিলা এক্সপ্রেসে চেপে হাওড়া থেকে রক্সৌল। রক্সৌলে পৌঁছলাম ২৬শে সকাল ১০টা নাগাদ। স্টেশন থেকে টাঙ্গায় বীরগঞ্জ। বাসস্ট্যান্ডে চা খেয়ে গাড়ি ঠিক করলাম সোজা কাঠমান্ডু যাব বলে। আগে বর্ডারে ক্যামেরা এন্ট্রি করাতে হতো, এখন আর এসব ঝামেলা নেই। নেপাল ভারতীয় সময় থেকে ১৫ মিনিট এগিয়ে। সেইমতো আমরা প্রত্যেকে ঘড়ির সময় ঠিক করে নিলাম, পাছে না পিছিয়ে পড়তে হয়! গাড়ির সঙ্গে চুক্তি হলো চার হাজার নেপালি টাকায়। ভারতীয় ১০০ টাকা মানে নেপালি ১৬০ টাকা। এবার থেকে টাকার হিসেব আমরা নেপালি টাকাতেই দেবো। আর একটা প্রয়োজনীয় তথ্য, নেপালে শনিবার ছুটির দিন।

সাতঘন্টায় সন্ধেবেলার মধ্যে কাঠমান্ডু। থামেল এলাকার 'ডিসকভারি ইন' এ উঠলাম। ভাড়া ১২৪০ টাকা, তিনখানা ঘরের। কাঠমান্ডু মানেই ফেলুদা - শিওর- শিহরণ, বিদেশিদের ভিড়, নানারকম বই, কার্ড, সিডি-ডিভিডি-র দোকান। দূরের কোনও রেস্টুরেন্টে এলভিস, বিটলস্। কিংবা লেন্সের চোখের ভেতর দিয়ে দরবার স্কোয়ার, পশুপতি, বোধনাথ, ক্যাসিনো। ভোর-ভোর ভক্তপুর বা পাটান। এগুলো ফেরার পথে হবে। আমাদের কাঠমান্ডু থেকে লুকলার প্লেনের টিকিট কাটা নেই। সকালে উঠে একবার চেষ্টা করবো, এই ভেবে যার-যার তার-তার স্যাক গুছিয়ে, লজের কম্বল টেনে নিলাম গায়ে।

সকালে ট্যাক্সিতে ১৫ মিনিটে ১৫০ টাকায় এয়ারপোর্ট। ভাগ্যিস আমরা আটজন, তাই অগ্নি এয়ারের প্লেনে পেয়ে গেলাম টিকিটও। ছোট্ট প্লেন। কলকাতার অটোকে তিনগুণ করলে যা হয় ! চেপেচুপে, সাকুল্যে, ১৮ জন বসা যায়। সত্যি, পুরোদস্তুর পাইলট ও তিনসত্যি, একজন মিষ্টি এয়ারহোস্টেসও আছে। টেক-অফ করার আগে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রত্যেকের হাতে একখন্ড লজেন্স!! সকাল ১০-৩০-এ প্লেন ছাড়ল। ভয়-ভয় করছিল এ প্লেন উঠবে তো! প্লেনের জানলা দিয়ে যা দেখা গেল, এক কথায়, তা, একঘর। মেঘগুলো এসে ধাক্কা খাচ্ছে জানলায়। তাকালে, এক জানলা

নেপাল। দূরে সাদা পাহাড়, নীচে কাঠমান্ডু শহর, গ্রাম, রুপোর হারের মতন নদী। মাত্র ৩০ মিনিটের এই উড়ান সারাজীবনের স্মৃতির রিংটোন।

টুক করে লুকলা। উচ্চতা ৯৩৫০ ফুট। স্যর এডমন্ড হিলারির সৌজন্যে তৈরি এই এয়ারস্ট্রিপ। আগে এখানে খুব কম হোটেল ছিল। এখন হোটেলে ছয়লাপ। ফেরার সময় এখানে প্রায় প্রত্যেক দলকেই প্লেনের টিকিট কনফার্ম করার জন্য থাকতে হয়। এয়ারলাইন্সের অফিস খোলা থাকে সাধারণত দুপুর ৩টে থেকে ৫-৬টা অবধি। এখান থেকেই পোর্টার ঠিক করে ফেললাম। ওরা নিজেদের মধ্যে মাল ভাগাভাগি করে নেওয়ার পর বেলা ১২টা নাগাদ শুরু হল হাঁটা। দুধকোশী নদীর বাঁদিক দিয়ে অল্প-অল্প ওঠানামা পথ। আজ যাব চেপলুং, ঘাট হয়ে ফাকদিং। প্রায় ৯ কিলোমিটার। যাব, ঠিক করেছি দ্রাবিড়ের মতো ঠুক-ঠুক করে। ছবি তুলব, পাখি দেখব। তাছাড়া এপথে বাপু ঝুঁকি থাকবেই। ঠিকমতো অ্যাক্লাইমেটাইজেশন না হলে মৃত্যু অবধি।

চারদিকে দোকানপাট। ট্রেকিং-এর সরঞ্জাম। নানারকম পাহাড়ি ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো নিটোল বাড়ি প্রত্যেকের। চতুর্দিকে ভর্তি বিদেশি। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের লোকই 'প্রেজেন্ট প্লিজ' এখানে, এই এভারেস্টের টানে। কেউ কেউ একা, কারোর-বা একশোজনের দল। মজা হল, সবাই আবার পুরো ট্রিপটা করে না, কেউ নামচে অবধি গিয়ে ফিরবে, কেউ হয়তো ফোরৎসে। একঘন্টা হাঁটার পর চেপলুঙ (৮৭৩০ ফুট)। জিরি থেকে মূল হাঁটা রাস্তাটা এখানেই আমাদাবলাম লজের কাছে এসে মিশেছে। সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে কুম্ভিলা (১৮৯০০ ফুট), বাঁদিকে কুসুম কাংরু (২০,৮৮৮ ফুট)।

এইভাবে ঘন্টা দুয়েক হাঁটার পর ঘাটে (৮৫০০ ফুট) পৌঁছলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে সামান্য চড়াই ভেঙে দেখলাম একটা বড় বোল্ডারে বৌদ্ধমন্ত্র লেখা -এটাই 'মণি-ওয়াল'। এরপর রাস্তা নিম্নমুখী। তিন-চার কিমি নেমে দুধকোশী নদীর ওপর দিয়ে সুন্দর লোহার ব্রিজ পেরিয়ে এলাম ফাকদিং (৮৫৬০ ফুট)-এর 'ফাকদিং স্টার' লজে। আজ থাকা এখানেই। পরদিন ভোরে উঠে জলখাবার খেয়ে লজের বাইরে এসে দেখি এখানে আকাশ নীল। নরম সূর্য সাদা পাহাড়ের পেছন থেকে উঁকি মারছে, তাকানো যাচ্ছে নির্নিমেষ, ডোরাকাটা ছায়া সূর্যের খেলা এই উপত্যকায়। দুধকোশীর দাঁড়ের শব্দ, পাঁজরে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর। এছাড়া অকারণ অন্য শব্দ নেই, মোবাইল নেই, পাড়ার গুলতানি নেই, উল্টোডাঙ্গার দূষণ, হাতিবাগানের হকার, গড়িয়াহাটের জ্যাম – কিচ্ছু নেই। উল্টে, একবুক সত্যিকারের নিশ্বাস। বেঁচে আছি, তাহলে, মনে হল অনেকদিন পর।

আজ বেনকার, মঞ্জো, জোরসালে হয়ে নামচে যাবো। প্রায় ১১ কিমি রাস্তা। কিছুক্ষণ হাঁটার পর জামফুটে পৌঁছলাম। এখান থেকেই গুমেলা আর পেমাচোলিং গুম্ফা যাবার রাস্তা আলাদা হয়েছে। হাল্কা চালে একটু একটু করে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে টোকটোক। আর একটু চড়াই ভাঙার পর দেখা মিলল থামসেরকু শৃঙ্গের (২১,৭১২ ফুট)। ছোট দুই গ্রাম বেনকার ও চুমোয়া পেরোলাম কুম্ভিলাকে সাক্ষী রেখে। লম্বা লম্বা চিরপাইন আর রডোডেনড্রনের ঝোপ। ভারি সুন্দর জায়গা। দুধকোশী নদীর সঙ্গে একটা ছোট শাখা এসে মিশেছে। ছবির মত সুন্দর লোহার ব্রিজ পেরিয়ে আধঘন্টা আরও চড়াই-এর পর মঞ্জো (৯,৩২০ ফুট) এসে পৌঁছলাম।এখানেই 'সাগরমাথা ন্যাশনাল পার্ক'। আগে ভারতীয়দের কোনও 'এন্ট্রি ফি' লাগত না, এখন ১০০ টাকা জনপ্রতি। এখানকার ছোট মিউজিয়ামটা মনে থাকবে। ১৫ মিনিট পর এল জোরসালে (৯,২২০ ফুট)। আজকের পথের শেষ গ্রাম। এখান থেকে নামচে অবধি অন্য কোন গ্রাম নেই। ভাঙতে হবে প্রায় দুহাজার ফুট চড়াই। জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাকানো রাস্তা উঠে নামচে। দুপাশে পাইনের সারি। তার মধ্যে বিভিন্ন পাখির কিচির-মিচির। এই রাস্তায় প্রচুর পাখি। যেই হাঁপিয়ে উঠছি, অমনি পাখি দেখার অজুহাতে অন্যদের থেকে পিছিয়ে, বিশ্রাম। নামচে (১১,৩১৯ ফুট) যখন, তখন সন্ধে। থাকব খুম্বু লজে। এখানে একদিন সারাদিন বিশ্রাম।

অশ্বখুরাকৃতি নামচে বাজার সোলো খুম্বু এলাকার সবথেকে বড় গ্রাম। প্রচুর হোটেল। রঙিন ঘরবাড়ি। প্রচুর দোকান, তিব্বতি সুভেনির, ট্রেকিং-এর সরঞ্জাম, এভারেস্ট বেসক্যাম্পের রুটম্যাপ আঁকা টি-শার্ট, হার, মালা, তাবিজ, ঘন্টা কি নেই। ইলেকট্রিক আছে, বার আছে, আবার জার্মান বেকারিও। ধর্ম আছে, আই.এস.ডি, সাইবার কাফেও। তবে গরম নেই একদম। বেলা বাড়লে মেঘ নেমে আসে পাহাড়ি সরু রাস্তায়। প্রায় প্রত্যেকেই এখানে একদিন বিশ্রাম নেয়, উচ্চতা মানিয়ে নেবার জন্য। এখান থেকেই খাবারের দাম ঊর্ধ্বমুখী। এভারেস্ট বলে কতা! ভাত, ডাল, সবজি ২৫০

www.amaderchhuti.com

টাকা থেকে ক্রমশ ৩০০/৪০০। চা ৪০, টোস্ট ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। টেন্টে থেকে খাবার নিজেরা বানিয়ে খেলে একটু সাশ্রয় হয়। তবে ঝামেলা, রেশন বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

নামচে থেকে অল্প উঠে মিলিটারি বেস। একটা সুন্দর মিউজিয়াম আছে এখানে। নামচের সর্বোচ্চ থেকে সমগ্র গ্রামটা যেন আরো সুন্দর। কুম্ভিলা (২২,৫০০ ফুট), কাংটেগা (২২,৩০০ ফুট), থামসেরকু (২১,৬৮০ ফুট) আদর করে ঢেকে রেখেছে নামচেকে। সিয়াংবোচে (১২,৭৯৫ ফুট) এলো আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর। এখানকার এভারেস্ট ভিউ হোটেল, যার নাকি টয়লেট থেকেও এভারেস্ট দেখা যায়, হল এত উচ্চতায় পৃথিবীর প্রথম পাঁচতারা হোটেল। ছোট্ট একটা হেলিপ্যাডও আছে এখানে।

এখান থেকে আমরা গেলাম কুমঝুং (১২,৪৩৪ফুট)। সময় লাগলো ৪০ মিনিট। কুমঝুং এই রাস্তার সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম। প্রত্যেক বাড়ি প্রত্যেকের যমজ। সবুজ বা নীল রঙের জানালা-দরজা। কোনো আওয়াজ নেই। কোথাও ধুলো নেই এক ফোঁটাও। লোকজনও চোখে পড়ছেনা। শেষমেশ একটা লজে লোক পেলাম। গরম কফিও। এখান থেকে অল্প দূরেই হিলারি হসপিটাল কুণ্ডে গ্রামে। ফিরলাম নামচেতে।

আজকের প্রোগ্রাম সানাসা, তালিঙ্গা, ফুনকিটেঙ্গা হয়ে থ্যাংবোচে (১২,৬৬০ ফুট)। নামচের টপ থেকে শুধু আমাদাবলাম, কাংটেগা, লোৎসে, এভারেস্ট দেখতে দেখতে ট্রেক পথ ধরে হন্টন। মাঝে মাঝে বন্টন হচ্ছে নিজেদের মধ্যে রাখা ড্রাই-ফ্রুট্স্, লজেন্স, জল, সারা বছরের ঘটনা সমগ্র। ভুজগাছ আর রডোডেনড্রনের জঙ্গল পেরিয়ে সানাসাগ্রাম। আরো আধ ঘন্টা নিচে নেমে দুধকোশীর সমতলে ফুনকিটেঙ্গা (১০,৬৬৩ ফুট) পৌঁছলাম। এরপর প্রাণান্তকর চড়াই। দুপুরের খাওয়া, দামগুলো আর বললাম না, খেয়ে প্রায় আড়াইঘন্টা চড়াই ভেঙে থ্যাংবোচে। জঙ্গলে এখানে, চোখ মেললে প্রচুর পাখি। নানান-রকম রেডস্টার্ট, ফর্কটেল, ব্রাউনডিপার, রোজফিন্চ, লার্ক, হুপো। থ্যাংবোচে পৌঁছনোর মুহূর্তে দেখা পেলাম মোনাল-এর। মোনাল-ঘোর কাটাতে না কাটাতেই যেন স্বর্গে এসে পৌঁছলাম। সামনেই বিখ্যাত থ্যাংবোচে মনাস্ট্রি। ১৯৯০ সালে আগুনে পুড়ে যাবার পর সারা পৃথিবীর লামাদের সহযোগিতায় আবার স্বমূর্তিতে স্বাগত জানাচ্ছে বিখ্যাত 'মণিরিমডু' নাচ নিয়ে। এই নাচ দেখার জন্য চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাংটেগা, আমাদাবলাম, তাবোচে, ক্যোয়ান্দে, তেংকাংবোচে। গ্রুপ ফটোর পেছনে উঁকি মারছে লোৎসে-নুপৎসে রিজ ও এ-পাড়ার দাদা এভারেস্ট। ছবি তোলার কথা মনে নেই, এইভাবে হতবাক হয়ে অনেকক্ষণ। বিদেশিরা, ক্যাজুয়াল - বিয়ারের ক্যান, কিংবা কফি হাতে জমায়েত হয়ে নিজেদের মধ্যে মশগুল। তাদের ব্র্যান্ডেড উইন্ডচিটার, জ্যাকেট ও টেন্ট আরো রঙিন করে তুলেছে থ্যাংবোচেকে। বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা বুঝতেই পারিনি এতক্ষণ।

www.amaderchhuti.com

থ্যাংবোচে থেকে একদিনেই ডিংবোচে বা ফেরিচে যাওয়া যায়। ডিংবোচেতে একদিন বিশ্রাম। তারপর লবুচে। আমরা যাব দুদিনের পথ তিনদিনে, বিশ্রাম নিয়ে। থ্যাংবোচে থেকে প্যাংবোচে হয়ে আজ যাব সোমারে (১৩,৩৫০ ফুট) সাড়ে ৫কিমি রাস্তা। চারপাশে রডোডেনড্রনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা ইমজা খোলার পাশ দিয়ে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে আমাদাবলাম আর লোৎসে-নুপৎসে রিজ। সামান্য চড়াই ভেঙে দেবোচে ও মিলিঙ্গো পার করে প্যাংবোচে পৌঁছলাম, প্রায় সাড়ে তিন কিমি পথ চলে এসেছি থ্যাংবোচে থেকে। প্যাংবোচে গ্রাম দুভাগে বিভক্ত। আপার। লোয়ার। বর্ধিষ্ণু আপার প্যাংবোচেতে এই অঞ্চলের সবথেকে প্রাচীন বৌদ্ধ গুম্ফা আছে। এক বয়স্ক চোর্তেনের কাছ থেকে খুব সুন্দর আমাদাবলাম উপভোগ করলাম। ইমজাখোলার পাশ দিয়ে চড়াই রাস্তা সোমারেতে (১৩,৩৫০ ফুট) গিয়েই শেষ। তিনখানা লজ আছে এখানে।

সোমারের 'ট্রেকার্স লজ'-টা খুব সুন্দর জায়গায়। তিনপাশ কাচ দিয়ে ঢাকা। ঘরের মধ্যে বসে-হেলে-শুয়ে ইমজাখোলা, পাহাড়ের সবুজ, আকাশের মেঘ, সবই। এখানেই প্রথম থমাস। একাই। নিবাস বেলজিয়াম। বছর ৪৫, ছ'ফিট তিন, মাথায় টাক, আপনভোলা, অবিবাহিত ঐ অবধি। সফরসঙ্গী বিবেকানন্দ-র ইংরেজি অনুবাদ। মুখের হাসি যুক্তাক্ষরহীন। হাতঘড়ি নেই। 'কটা বাজে' জিগ্গেস্ করলে 'ওয়ান মিনিট' বলে পকেট থেকে ছোট্ট ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে যা-খুশি ছবি তুলে, ছবির সময় দেখে, জানায়। সেই ইস্তক ৮৪টা দেশ যার ঘোরা হয়ে গেছে তার সঙ্গে নেই কোনও ম্যাপ, ট্রেকিং গাইড, পরিকল্পিত কোনও প্ল্যান। যেখানে খুশি যাইতে পারে, একা বা অন্য দলের সঙ্গে। যাহা খুশি খাইতে

পারে। এক জায়গায়, পছন্দ হলে, থেকেও যেতে পারে বহুদিন। এরপর হয়ত শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান-বাংলাদেশ। ছমাস এইভাবে। তারপর দেশে ফিরে ছমাস উপার্জন -এই হল থমাস। সেদিন, সারা সন্ধেজুড়ে, সোমারেতে, ও-ই।

সোমারে থেকেই ট্রিলাইন শেষ হতে শুরু করেছে। এক কিমি পর অরশো ও দেড় কিমি পর সুরো ওগ্। জায়গাটা পাথুরে উপত্যকা, ছোট ছোট কাঁটা ঝাউগাছে ভর্তি। এই সুরো ওগ্ থেকে ডিংবোচে ও ফেরিচের রাস্তা আলাদা হয়েছে। ইমজা খোলা হাত ধরেছে খুম্বু গ্লেসিয়ার থেকে আসা খুম্বু খোলার সঙ্গে। একটা বড় চোর্তেন পেরোতেই দেখা মিলল ডিংবোচে (১৪,৩০০ ফুট) গ্রামের। পাহাড়ের ঢালে বেশ বড় গ্রাম। প্রায় ২০-২২টা লজ আছে এখানে। বলতে চাইনা, রাতে কিন্তু এখানে মাইনাস্।

পৃথিবীর তিনখানা উচ্চতম শৃঙ্গ এখান থেকে দেখা যায়। লোৎসে, মাকালু আর চো ওউ। এছাড়া লোৎসে সার, আমাদাবলাম, থামসেরকু, কাংটেগা তো আছেই। এখান থেকে আমাদের যাবার কথা চুঘুং (১৫,৫৮৪ ফুট)। দু তিন ঘন্টার পথ। চুঘুং থেকে আমাদাবলাম, লোৎসে সার দুর্দান্ত। চুঘুং তো আবার আইল্যান্ড পীকের বেসক্যাম্প। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘেদের আনাগোনা বেড়ে চলেছে ক্রমশ। তাই ঠিক হল, চুঘুং প্ল্যান ক্যানসেল করে সামনে যতদূর যাওয়া যায় যাব। হাঁটা আরম্ভ করার পর স্নো-ফল হল কিছুক্ষণ। নীচে ফেরিচের ঘরবাড়ি, খুম্বু খোলা ভ্যালি। পাথুরে রাস্তা, দূরে একটা লেক দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ওটাই চোলা লেক। ঘন্টা দুয়েকে সাড়ে চার কিমি হেঁটে দুগলা (১৫,০৯০ ফুট) পৌঁছলাম। আকাশ সম্পূর্ণ মেঘে ঢাকা। এখান থেকে লবুচে আরো দুঘন্টার চড়াই। ভারী মেঘ নেমে আসছে, খুব ঠান্ডা। আজ এখানের 'ইয়াক লজে' বডি ফেলা হবে তাই চা খেয়েই চোলা লেকের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। এক ঘন্টা পর চোলা দেখতে পেলাম। উঁচু পাহাড়ের কোলে একরত্তি রূপসায়র। দুগলায় ফিরলাম নিঃসঙ্গ লেকের কাছে কিছুটা সময় কাটিয়ে ।

দুগলায় পরের দিন আকাশ অংশত মেঘলা। লজের পেছনদিকে তাবোচে আর চোলাৎসে স্পষ্ট। আর সামনে থামসেরকুর থাম্বনেল। আজ যাব লবুচে। কমবেশি তিন কিমি রাস্তা। প্রথম চড়াই ভেঙেই উঠলাম চুপকি-লাড়ায় (১৫,৮৭৯ ফুট)। শুধু বোল্ডার, গাছপালার সিন নেই। খুম্বুৎসে, পুমোরি আগে দেখা গেছে, এখান থেকেই প্রথম লিনট্রেন। এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মেমোরিয়াল পাথর আর প্রেয়ার-ফ্ল্যাগ দিয়ে সাজানো। তাঁদের মধ্যে স্কট ফিশার ও বাবুচিরি শেরপার নাম উল্লেখযোগ্য। এমনিতেই মেঘের জন্য মনখারাপ, এই জায়গাটায় এসে আরো ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লাম সবাই। তিনঘন্টায় লবুচে এলাম। এসেই ১৫ মিনিট ছুটে পৌঁছলাম পিরামিড রিসার্চ সেন্টারে। ১৯৯০ সালে তৈরি ইতালীয়দের দ্বারা পরিচালিত পৃথিবীর উচ্চতম রিসার্চ সেন্টার। এভারেস্ট সংলগ্ন আবহাওয়ার পরিসংখ্যান রাখা হয় এখানে। ফিরে এসে লজের মধ্যে চা কফি খেয়ে সময় কাটল। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে আকাশ দেখি, মেঘ কমলো না বাড়ল। রাতে দুশ্চিন্তায় ঘুম হলো না ভালো করে। সকালে উঠে দেখি চারদিক বরফে বরফ। সামনের পাহাড়গুলো সাদা, বাইরে চেয়ার-টেবিল, রাস্তা, লজের ছাদ, নর্দমা সব সাদা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে বেড়িয়েই পড়লাম গোরাক শেপের দিকে। সাড়ে তিন কিমি পথ। চাঙরি গ্লেসিয়ারের মধ্যে দিয়ে । প্রথমদিকে সমতল, শেষের একঘন্টা ঝুড়ো পাথরের রাস্তা দিয়ে চড়াই। তিনঘন্টার মধ্যে গোরাক শেপ (১৬,৯৬০ ফুট)। এখানে ব্যাপক ঠান্ডা। সামনে কালাপাথর দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে ১,২০০ ফুট হবে কালাপাথরের চূড়া। কিন্তু প্রায় সমস্ত জায়গাটাই মেঘে ঢাকা। এত মেঘ আর বেলাও অনেক তাই বেসক্যাম্পের দিকে গেলাম না। সামনেটাতেই ক্যামেরা নিয়ে ঘোরাঘুরি করলাম। সামনের ভ্যালিতে ছোট একটা জলাশয়। এখানকার ক্যাম্পিং সাইট। হঠাৎ দেখি গোল্ডেন ঈগল উড়ে বেড়াচ্ছে মাথার ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে ছবি, ছবি তোলার চেষ্টা। এদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে -সঙ্গে মেঘও বাড়তে থাকে। এবং ঠান্ডাও। লজের মধ্যে যখন এসে ঢুকি তখন দুপুর দুটো। ব্যস, এবার সারাদিন রোববার। চা, কফি, স্যুপ, গল্প, তর্ক বিদেশিদের সঙ্গে হাল্কা আদান প্রদান। এত উচ্চতায় প্রত্যেকটা লজই যেন একটুকরো বিদেশ। এক অর্থে বিদেশি তো আমরাও!

রাতে, অ্যালার্মে, ঘুম ভাঙলো ৩টে ৪৫ মিনিটে। শাল, টুপি, জ্যাকেট-ফ্যাকেট লাগিয়ে, ক্যামেরা বাগিয়ে লজের বাইরে এসে দেখি অসাধারণ পুমোরি। কিন্তু আবহাওয়ার কোনো উন্নতি নেই। হৃদয়ে কালাপাথরের শীর্ষ নিয়ে দ্রুতগতিতে চড়াই ভাঙি, সানরাইজটা একেবারে টপ থেকে যাতে দেখা যায়। প্রথম একঘন্টা ঝুরোবালি রাস্তা, শেষের একঘন্টা বড় -বড় বোল্ডার। একদম চূড়াটা পাথর আর প্রেয়ার ফ্ল্যাগ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। একটু দূরে পিরামিড রিসার্চ

www.amaderchhuti.com

সেন্টারের যন্ত্রপাতি। প্রচন্ড হাওয়া - দাঁড়ানো যাচ্ছে না ভালো করে। নীচে,অনেক দূরে এভারেস্ট বেসক্যাম্পের টেন্টগুলো দেখা যাচ্ছে। পেছন দিকটা অর্থাৎ পুমোরি, লিনট্রেন, খুম্বুৎসে-এই পাহাড়গুলো প্রায় পুরোপুরি মেঘে ঢেকে আছে। আর আমাদের একদম চোখের সামনে জানলা খুলে উঁকি মারছে এভারেস্ট, মাকালু মাঝে মাঝে, নুপৎসে, লোৎসে, ওয়েস্ট সোলডার, সাউথকল, একটু দূরে আমাদাবলাম, কাঙটেগা, চোলাৎসে, তাওচে প্রভৃতি। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি অনেকটা সময়। এইজন্যই এতদূর। এভারেস্ট। এইতো সেই শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ। একে জয় করবে বলে কত হাজার হাজার মানুষ মৃত্যু বরণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। স্মৃতির জন্য আমাদের ক্যামেরার বেশ কিছু 'জিবি'এখানেই খরচা করে দেড়ঘন্টা পর নীচে নামতে শুরু করলাম। চারদিক মেঘে ঢেকে গেছে, দেখা যাচ্ছে না প্রায় কিছুই। আমাদের লজ 'স্নো ল্যান্ড হায়েস্ট ইন'এ গিয়ে চা খেয়ে চললাম বেসক্যাম্পের (১৭,৪০০ ফুট) দিকে।

খুম্বু হিমবাহের ডান পাশের মোরেনের পাশ দিয়ে কালাপাথরের গা বরাবর বোল্ডার ভর্তি উঁচু-নিচু রাস্তা। যাতায়াত মোট ছঘন্টা লাগে। আবহাওয়া খারাপ হওয়ার জন্য একটু পা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে আলো থাকতে-থাকতে ফিরতে পারি। দুঘন্টার মধ্যে বেসক্যাম্পে চলে এলাম। এখান থেকে এভারেস্ট দেখা যায় না। এখানে অন্য উন্মাদনা। অন্য পাঠক্রম। 'উঠব-উঠব' ভাব। আর হাঁটার রাস্তা নেই, এবার ক্লাইম্বিং। রোমাঞ্চ, এখান থেকেই ম্যালরি, তেনজিং, হিলারি। মেসনার, একাই বহুবার। এখন সামনেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর একদল তাঁবু খাটিয়েছে অভিযানের জন্য। ৩-৪ জন সামিট করবে , তারজন্য অন্তত ১০০ জনের সাপোর্ট-টিম এখানে। প্রচুর পোর্টার আর ইয়াক মালপত্র নামিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। এক-দেড় মাসের খাবার রসদ, ওষুধপত্র, প্রয়োজনীয় ক্লাইম্বিং-গিয়ার। সর্বত্র অভিযাত্রীদের পরিত্যক্ত জিনিষপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ডানদিকে খুম্বু গ্লেসিয়ারের উৎস বাঁদিকে মূল বেসক্যাম্প। খুম্বুর আইসপিনাকলগুলো যেন এক একটা আস্ত পাহাড়ের ছোট রেপ্লিকা। কিছু ভয় কিছু বিস্ময় নিয়ে গোরাক শেপের ছেলে গোরাক শেপে ফিরলাম বিকেল ৪-৩০ -এ।

পরের দিন ভোরে উঠে দেখি আবহাওয়া একদম খারাপ। লজের বাইরে যতদূর দেখা যাচ্ছে শুধু তুষার। তুষারাবৃত সারা গোরাক শেপ। মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এত উচ্চতায় বেশিদিন থাকা যাবেনা, এবার ফিরতে হবে। চারদিকে শুধুই বরফ ঝরছে, শুধুই তুষার। মনেই হবেনা এত কাছে এতগুলো পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্ঘবদ্ধ অভিমান নিয়ে ফিরে তাকাই চূড়ান্ত দ্রাঘিমার দিকে। দিগন্ত, তখনও সাদা।

www.amaderchhuti.com

☐ তথ্য- এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেক (নেপাল) ☐|| ☐ এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেকিং-এর ছবি ☐|| ☐ এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেক রুট ম্যাপ

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher